উৎস মানুষ

৩৩ বর্ষ • ১ম সংখ্যা • জানুয়ারি - মার্চ ২০১৩

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আমাদের কথা		
অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা		২
চাই না বিষ-ফসল	সুনীতিকুমার মণ্ডল	৯
এক ঘুমভাঙানিয়া বই	দীপক ভট্টাচার্য	১৫
আবহাওয়া চেনার সহজপাঠ	বিবেক সেন	১৮
ত্বকের রোগ ও খাদ্যভাবনা	জয়ন্ত দাস	২১
বাইপাস অপারেশন	গৌতম মিস্ত্রি	২৪
চিকিৎসকের উপহার রোগ	ভবানীপ্রসাদ সাহু	২৯
কোরোয়া বনবিহারী	সমীরকুমার ঘোষ	৩১
কানোরিয়া	শীলা চক্রবর্তী	৩৫
খনিজ আকরিক উত্তোলন	অরুণ পাল	৩৭

সম্পাদক: **সমীরকুমার ঘোষ**

রেজিস্টার্ড অফিস - বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক,কলকাতা-৬৪

কার্যালয়
খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন
বি ৪ ও ৫, এস-৩, নারায়ণপুর
পোঃ (আর) গোপালপুর কলকাতা-৭০০১৩৬
ফোন:
৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/৯৮৩১৪৬১৪৫৬
ওয়েবসাইট : www.utsamanush.com
ই-মেল- utsamanush1980@gmail.com

ধ্বংসের ধাষ্টামি

আমাদের জীবন এমনিতে বেশ ম্যাড়মেড়ে। কেউ প্রশ্ন তুলতে পারে তা কেন, টিভির বিতর্ক-অনুষ্ঠান আছে, পত্রপত্রিকায় সাহসিনীদের পোশাক-বর্জন আছে, আমরি, বিষমদ, ধর্ষণ, সমকামিতা, টি-টোয়েন্টি — মুহুর্মুহু উত্তেজনার অবিরাম খোরাক রয়েছে, তার কী! এগুলো আছে বটে, তবে এর উত্তেজনা বড়ই ক্ষণস্থায়ী। তাই ক্ষেপার পরশমণি খোঁজার মতো আমরা দীর্ঘস্থায়ী উত্তেজনা খুঁজি। হালফিল পেয়েও গিয়েছিলাম। ২০১২-র ২১ ডিসেম্বর। পৃথিবীর ধ্বংসের দিন। কটা দিন চর্চা, উদ্বেগ, উপহাস, অবিশ্বাস— সব মিলিয়ে মন্দ কাটল না। শেষে দেখা গেল সবই 'মায়া'! হ্যালির ধুমকেতুর মতো মাঝে মাঝেই ফিরে আসে উত্তেজনার সর্বোৎকৃষ্ট খোরাকটি। আবার কোনো ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য প্রতীক্ষা শুরু!

খবরে প্রকাশ কিং ফিশার কোম্পানির মালিক কর্মচারীদের মাইনে দিতে পারছেন না বটে, কিন্তু সম্প্রতি তিরুপতি মন্দিরে ২০ কেজি সোনা দিয়ে এসেছেন। কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, ভগবান অত সোনা নিয়ে করবেন কী? ভগবান কি স্বর্ণভূক? কেউ এও বলতে পারেন, ভগবান বলে কি মানুষ নয়!

আগের দু বছর অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতার আয়োজন হয়েছিল জীবনানন্দ সভাঘরে। লোক হয়েছিল মুষ্টিমেয়। এবার বাংলা আকাদেমি ভাড়া নিয়ে তাই বেশ চিন্তা ছিল। কারণ এটি অনেক বড়। কিন্তু আমাদের অবাক করল দর্শক-উপস্থিতি। হল প্রায় ভরে গিয়েছিল। 'কেমন আছে মেয়েরা' —যুক্তি-তর্কে চমৎকার বিশ্লেষণ করলেন স্বাতী ভট্টাচার্য। তার আগে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স্ক শিক্ষা বিভাগের পরিচালনায় ছোট ছোট লোধা ছেলেমেয়েরা নজর কাড়ল তাদের অধীত বিদ্যার উপস্থাপনায়।

২৬ জানুয়ারি থেকেই অলিখিতভাবে শুরু হয়ে যাবে কলকাতা বইমেলা। আমরা এবারও থাকছি মেলায়। বন্ধু-শুভানুধ্যায়ীদের সঙ্গে সেখানেই হবে দেখা।

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক

স্মারক বক্তৃতা দিচ্ছেন স্বাতী ভট্টাচার্য। লোধা পরিবারের শিশুদের অনুষ্ঠান, বাংলা আকাদেমিতে

মেয়েদের জনবৃত্তে আসতে হবে

স্বাতী ভট্টাচার্য

প্রয়াত অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণে গত তিন বছর এক স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হচ্ছে। এবার বক্তা ছিলেন স্বাতী ভট্টাচার্য। বিষয় ছিল: 'এ উপমহাদেশে মেয়েরা কেমন আছে'। বাঁকুড়ার লোধা সম্প্রদায়ের বেশ কিছু ছোট ছোট ছেলেমেয়ের মধ্যে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে শিক্ষার আলো। বক্তৃতার আগে মঞ্চে ওরা দলবদ্ধভাবে পেশ করল ওদের শিক্ষার নমুনা। দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীতে পড়া খুদেরা বেশ আত্মবিশ্বাসী। যদিও ওরা জানে না, কতদিন ওদের শিক্ষার আয়ু। দারিদ্র্য এবং আনুষঙ্গিক নানা সমস্যা ওদের শিক্ষার অঙ্গন থেকে যে হামেশাই দূরে সরিয়ে নেয়।

স্বাতী শুধু এক বিখ্যাত দৈনিকের কৃতী সাংবাদিকই নন, দীর্ঘদিন মেয়েদের সমস্যা নিয়ে কাজ করছেন। দেশ-বিদেশ ঘুরে নানা অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করেছেন। এ দিনের আলোচনায় তাই স্বভাবতই উঠে আসে নানা তথ্য, বিশ্লেষণ, পরিসংখ্যান। শেষে যথারীতি জমে ওঠে প্রশ্নোত্তর পর্বটিও। স্বাতীর সেই বক্তৃতাটি উৎস মানুষের পাঠকদের জন্য এখানে মুদ্রিত করা হচ্ছে।

আপনারা জানেন, সহজ প্রশ্নগুলো সবচেয়ে কঠিন হয়। মেয়েরা কেমন আছে এই প্রশ্নটার উত্তরটাও তেমনি। ইংরেজিতে একটা ছড়া আছে যে, একটা শুঁয়োপোকা যে দিব্যি হাঁটছিল, এমন সময় একটা দুষ্টু মৌমাছি এসে তাকে প্রশ্ন করল, 'তুই কোন্ পাগুলো আগে ফেলিস আর কোনগুলো পরে ফেলিস?' তা শুনে সে এমনই ঘাবড়ে গেল যে, সে আর হাঁটতে পারল না। সে একপাশে পড়ে রইল। আর ভাবতে লাগল, তাই তো কোনটা আমি আগে ফেলি! এই কেমন আছো যে প্রশ্নটা সে প্রশ্নের আমরা সহজ একটা সৌজন্যমূলক উত্তর দিই, এই তো ভালই আছি। আমরা দিনের মধ্যে ৫-৬ বার, ৮-৯ বার করে বলে থাকি, এই তো চলে যাচ্ছে। বিদেশে আবার খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে I am great, very well। আমরা একটু স্তিমিতভাবে বলি এই তো চলে যাচ্ছে। কিন্তু যদি কখনও সত্যি প্রশ্নটার মুখোমুখি হতে হয়, যদি প্রশ্নটা অন্যকে না করে নিজেকে করতে হয়, তাহলে প্রায় স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়। কারণ কেমন আছি আমি আর আমার মতো অনেক মেয়ে, তারা কেমন আছে —এ সহজ প্রশ্ন নয়। শুধু মেয়ে কেন যে কোনও মানুষের ক্ষেত্রে এটা সত্যি। তখন হঠাৎ করে হোঁচট খাওয়ার মতো অস্তিত্বের সংকট তৈরি হয়ে যায়।

আমার চারপাশে যা ঘটছে, আমার চারপাশে যে মানুষরা

রয়েছেন তাঁদের সঙ্গে দেখেই তো আমায় ঠিক করতে হবে যে, আমি কেমন আছি। অনেকে বলেন সুখী হচ্ছে সেই লোক যে নিজের ভায়রাভাই-এর থেকে অন্তত ১ টাকা বেশি মাইনে পান। তো সেই রকম আমাদের জীবনে চারপাশ দেখে আমি ঠিক করি, আমি কেমন আছি। আর এই কালে আমাদের অর্থনীতির সংখ্যা খুব ব্যবহার করতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। রাজনীতিতে এখন এটা খুব চলে। তাই সেদিক থেকে দেখতে গেলে যে, কেমন আছো বললে বোঝার জন্য আমরা দেখি, আমার চারপাশে যারা আছে তাদের বাড়ি কেমন আর আমার কেমন। কে কেমন আছে দেখতে গেলে আমরা বলি পাকা বাড়ি না কাঁচা বাড়ি, একে জল আনতে অনেক দূরে যেতে হয় নাকি বাড়ির মধ্যেই পায়? সুতরাং চোখের দেখা এবং পরিসংখ্যানগত থাকা—এ দুটোর মধ্যে আবার তফাত রয়ে যায়।

আমি যে এম এ পাস করেছি সেটা শিক্ষিত কয়েকজনের মধ্যে বসে বলার মতো কিছু নয়। কিন্তু আমার দেশে মাত্র ৭ শতাংশ মানুষ উচ্চশিক্ষায় যেতে পারে, কারণ সিটই অত বেশি নেই! যোগ্যতার প্রশ্ন নেই। সুতরাং আমি অসামান্য ভাল আছি। কারণ আমি টপ ৭ শতাংশের মধ্যে আছি। আমার যে পেনশন আছে, আমার বিমা আছে সেটা তো আমাকে ১০ শতাংশের মধ্যে ফেলে রেখেছে। এই যদি আমার পরিচয় হয়, সেটাও একটা উত্তর, আমি কেমন আছি, সেটা বলার জন্য। কিন্তু আজকে সেভাবে চিন্তা করতে চাই নি। চিন্তা করতে চাই নি কারণ এটা খুব বোরিং। কারণ, আপনারা গুগল সার্চ-এ গিয়ে এ ফিগারগুলো পেয়ে যাবেন যে, মেয়েদের স্বাস্থ্য কেমন, অপুষ্টি কেমন, তাদের শিক্ষার হার কত, শিক্ষা কতদূর, কটা ছেলেমেয়ে রয়েছে, কজন জন্মনিরোধক ব্যবহার করতে পারছে, কজন পারছে না, কজন সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মারা যাচ্ছে —কিন্তু এগুলোর গোলমাল এখানেই এটা এক ধরনের ইন্ডিকেটর তো বটেই, এগুলোর একটা প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু কেমন আছো এই প্রশ্নের উত্তরে এর পরিসংখ্যান দিয়ে বোঝার চেষ্টা একটু গোলমেলে।

অমর্ত্য সেন বলেছিলেন যে, যখনই আমাদের দেশে বয়স্ক বিধবা মেয়েদের জিজ্ঞাসা করা হয় যে, কেমন আছো। তাঁরা সবসময় বলেন আমরা খুব ভাল আছি। আমি আমার ছেলের সঙ্গে আছি বা মেয়ের সঙ্গে আছি। আমরা দুবেলা দুটো রুটি পাই, তাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, আচ্ছা আপনার মাথায় ব্যথা নেই, কোমরে ব্যথা নেই? না, সে সব তো আছে। আপনার খরচ করার জন্য হাতে পয়সা কী আছে: না, সেসব তো নেই। অর্থাৎ ভাল থাকার যা কিছু কোনটাই তাঁর নেই। কিন্তু তিনি মনে করেন তিনি ভাল আছেন। আবার উল্টোটাও হয়। চিন্তা করুন, একটু সম্পন্ন, একটু উচ্চবিত্ত কিন্তু অত্যন্ত সংরক্ষণপন্থী একটা বাড়ির কথা, তাদের গৃহবধূদের কথা, সে পড়াশোনাও মোটামুটি করেছে, এমন কি এম বি এ-ও সে করে থাকতে পারে তার খাবারের অভাব নেই, বছরে দু'বার হয়ত বেড়াতেও যায়, কিন্তু তার স্বামী, তার পুত্রকন্যা তাকে অত্যন্ত তাচ্ছিল্য করে। তুমি তো ইংরিজিই বলতে পারো না, তোমাকে নিয়ে কোনো জায়গায় যাওয়া যায়না, পাঁচজনের সামনে তোমাকে নিয়ে যাওয়াই যায় না, তুমি তো স্মার্টই নও।

> কেরলের প্রত্যন্ত গ্রামেও বিয়ের গয়না কিনুন বলে গয়নার যে বিজ্ঞাপন সেটা হয়ত কলকাতার বড় বড় রাস্তা ছাড়া চিন্তা করা যায় না। কিন্তু পারিবারিক হিংসা সেখানে অত্যন্ত বেশি। যার ফলে কেরল বোধহয় একমাত্র রাজ্য যেখানে মানসিক স্বাস্থ্য, হতাশা, উদ্বেগ এগুলোকে জনস্বাস্থ্যের সমস্যা বলে সরকার থেকে ঘোষণা করা হয়েছে। তাহলে মেয়েরা কোথায় ভাল আছে? কী জেনেছি সারাজীবন, আর কী দেখলাম!

সম্প্রতি ইংলিশ-ভিংলিশ বলে একটা ছবি এসেছিল। যেখানে ইংরিজি বলতে পারে না বলে একটি মেয়ে, যথেষ্ট মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও তাকে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের মুখে পড়তে হয়। এ মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আপনি কী করে বলবেন, না বাপু তুমি তো খেতেও পাও আবার বরের সঙ্গে ঘুরেও আস ফ্রান্স কি ইংল্যান্ড। সুতরাং, তুমি আবার খারাপ কোথায় আছ, তুমি তো ভালই আছ। এ তো বিদ্রূপের মতো শোনায়। এটা শুধু যে ব্যক্তিগত স্তরে তাই নয়। আমি নিজে সাংবাদিক হিসেবে দেখেছি কালেক্টিভ লেভেলেও কিন্তু এই পরিসংখ্যান বড্ড বিভ্রান্ত করে।

ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি কেরলের মেয়েরা খুব ভাল আছে। তারা উচ্চশিক্ষিত। তারা দেরিতে বিয়ে করে, তাদের সন্তান বেশি হয় না। কেরল এমনই মডেল। আজকাল তো কেরলের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের তুলনা করাই ছেড়ে দিয়েছি। আমরা তামিলনাড়ু বা অন্ধ্রপ্রদেশের সঙ্গে করি। ও অতদূর পৌঁছনো যাবে না! আমি যখন কেরলে গেলাম, দেখলাম আমাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মেয়েরা যেখানে অনেকে মাসে কষ্ট করেও ২ হাজার টাকা রোজগার করতে পারে না, সেখানে ওখানকার মেয়েরা সত্যিই মেয়েরা ভাল রোজগার করছে। তার সঙ্গে গরু পালন করছে। এক-একজন মাসে ১০ হাজার টাকাও রোজগার করছে, যেটা আমাদের এখানে মেয়েদের কল্পনার অতীত। কিন্তু যখন তাদের জিজ্ঞাসা করলাম, এ টাকাটা নিয়ে তোমরা কী কর? এ টাকাটা একজন মা অসামান্য পরিশ্রম করে

বুঝতেই পারছেন যে একসঙ্গে তিনটে চাষ করছে, সে কতটা পরিশ্রম করছে! সে জমায় তার মেয়ের বিয়ের পণের জন্য। আমি কোনোভাবে কেরালার সাফল্যকে ছোট করছি না। তারা নিশ্চয়ই অসামান্য কাজ করেছে। এবং সেই কাজের অনেকটা আমাদের অবশ্যই অনুসরণ, অনুকরণ করা উচিত।

কিন্তু ঐ পরিসংখ্যান দিয়ে আমরা যদি একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাই সেটা মেয়েরা কেমন আছে, তার একটা পূর্ণ চিত্র আমাদের কাছে এসে পৌঁছায় না। তাই আমি ভেবেছি যে, আজকে বোধহয় এ প্রশ্নটা করা যেতে পারে যে, মেয়েরা কেমন আছে সেটা আমরা জানব কেমন করে? কে বলবে মেয়েরা কেমন আছে? মেয়েরা যখন বলতে যায় যে তারা কেমন আছে তখন সেটা যদি বিপজ্জনক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় সেটা তো আমরা বুঝতেই পারছি। মালালার কথা আপনারা সকলেই জানেন। তালিবানের অধীনে তার জীবন কেমন, কেমন তার লাগছে স্কুলে যেতে। স্কুলে যখন যেতে পারছে না, কেবল এইটুকুই সে বলতে গেছিল তাতে তার এই দশা হয়েছে। কিন্তু আরেকটি মেয়ে মারা গিয়েছে পাকিস্তানে তার কিছুদিন আগে তার কথাও বলা দরকার। এ মেয়েটি সাংবাদিক। এ পরপর ৩ মাস মাইনে পায় নি। চতুর্থ মাসে লাহোরে যেখানে ও কাজ করে তার সম্পাদক-মালিক বললেন যে, তোমাকে মাইনে দেয়া হবে না। সে পরিবারের একমাত্র রোজগেরে। সামনে ইদের উৎসব ছিল। সে বুঝতে পারল যে তার বাবার চিকিৎসার টাকা বা ছোটভাইদের জন্য জামাকাপড় নিয়ে ফিরতে পারবে না, তখন সে আত্মহত্যা করে।

এটাও বোঝার দরকার এইজন্য যে, কেবল যে সরাসরি মেয়েদের গুলি চালিয়ে বা জোর করে ঘরে পুরে ভয় দেখিয়ে চুপ করে দেয়া হচ্ছে তাই নয়, তাচ্ছিল্য করেও বহু মেয়েকে অনেক বেশি মেয়েকে চুপ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তুমি যেটা বল, সেটা বলার মতো কথা নয়, সেটা কোনও দামি কথা নয়। সেটা শুনতে আমার আগ্রহ নেই, তুমি বাড়ি চলে যেতে পার। তোমায় লিখতে হবে না, তোমায় বলতে হবে না, আমাদের আগ্রহ নেই। বলতে হলে বল বিনা পয়সায়, না হলে চলে যাও। এই কারণেই মেয়েরা কেমন আছে, সেটা আমাদের কাছে স্পষ্ট হচ্ছে না। তাই আজকে আমরা একটু এভাবে যদি চিন্তা করি যে কীভাবে আমরা বুঝতে পারি মেয়েরা কেমন আছে? মেয়েরা কথা বলছে। মেয়েদের কথায় মেয়েরা কেমন আছে এই যদি আমরা বোঝার একটা চেষ্টা করি তাহলে আমরা কি হাতের কাছে পেতে পারি? অবশ্যই একটা সংবাদ মাধ্যম। আর একটা যে মেয়েরা প্রতিনিধি হিসেবে সর্বসমক্ষে অর্থাৎ সেটা প্রধানত রাজনীতিতে কথা বলতে পারে। আর, যেখানে সরাসরি। কোনও প্রতিনিধির মাধ্যমে নয়। কিন্তু গোটা দক্ষিণ-এশিয়া জুড়ে একেবারে তৃণমূল স্তরে এমন কিছু অংশ গ্রহণের মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে যেখানে এসে স্থানীয় মানুষ, গ্রামের মানুষ, গরীব মানুষ কথা বলতে পারে। সেখানে দাঁড়িয়ে মেয়েরা কী বলছে? আমার মনে হয়েছে যে, রাজনৈতিক সমাজের ক্ষেত্রে এই তিনটি হচ্ছে মেয়েদের কণ্ঠ বোঝার একটা প্রথম প্রধান জায়গা। এর সঙ্গে অবশ্যই একটা বড় জায়গা আছে যেটা হচ্ছে সাহিত্যের জায়গা, যেটা হচ্ছে সংস্কৃতির জায়গা যেখানে মেয়েরা নিজেদের মেলে ধরছেন চলচ্চিত্রের মাধ্যমে, নানা সৃজনশীল কাজের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু প্রথমত, আমার সে এলাকায় প্রায় কোনওই দক্ষতা নেই। আর দ্বিতীয়ত সেটা একটু অন্যভাবে আলোচনার বিষয়। তাই নিজেকে এর মধ্যেই রাখছি আজকে। এগুলো যে জরুরি তার একটা কারণ তো অবশ্যই যে গণতন্ত্রে আমরা বিশ্বাস করি যে, যার কথা তাকে বলতে হবে। আর কেউ বলে দিতে পারবে না। নিম্নবর্ণের কথা উচ্চবর্ণ বলবে না, কালোর কথা সাদা বলবে না, মেয়েদের কথা পুরুষ বলবে না। তাদের কথাই শুনতে হবে এটাই নিয়ম। কিন্তু এ ছাড়াও আরো কিছু বিবেচনার আছে। তার একটা তো অবশ্যই এই যে, বস্তুত একটি মেয়ে ভাল থাকে কখন, যে কোনও মানুষ ভাল থাকে কখন, যখন সে যা চায় সেটা সে পায়। আর তারই নাম হল ক্ষমতা। আমার যা দরকার, আমার যা ইচ্ছে, আমার যা আকাঙ্ক্ষা, আমার জীবনে সেটাকে নিয়ে আসা যে সত্যি সেটাই আমাকে ভাল রাখে। একেই বলে ক্ষমতা। এই যে ক্ষমতায়ন সেটার যদি আমি একটা পরিমাপ করতে চাই তা হল, আমি কথা বলতে পারছি কিনা, সবার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমার যা দরকার সেটা আমি প্রথম কথা প্রকাশ করতে পারছি কিনা আর দ্বিতীয় কথা সেই প্রকাশের দ্বারা আমি আমার যা প্রার্থিত বস্তু সেটা লাভ করতে পারছি কিনা। সুতরাং তার কথা বলার, সে কথা বলাটা শুধু শব্দের মাধ্যমে না হতে পারে, এমন কি কেবলমাত্র তার উপস্থিতিতেও হতে পারে। আমরা দেখেছি গ্রামে যে ধরনের সভাগুলো হয় সেখানে যারা বহু লোক গরীব মানুষ শুধুমাত্র যারা উপস্থিত থাকে সে সব গ্রামে কিন্তু গরীবদের জন্য allocation ভাল হয়। তাঁরা কী বলছেন, আদৌ কথা বলছেন কি বলছেন না সেসব আর ধরাই করা হচ্ছে না। দেখাই হচ্ছে না, শুধুমাত্র উপস্থিতি দেখা হচ্ছে। অর্থাৎ অনেক লোক যখন এক জায়গায় আসে তখনই বুঝিয়ে দেয় তারা কী চাইছে, তাদের উপস্থিতির সেটা একটা স্টেটমেন্ট। সুতরাং মহিলারা আসতে পারছেন কি না এক অর্থে সেটাও তাদের বক্তব্য প্রকাশের, তাদের মত প্রকাশের সেটাও একটা সুযোগ। প্রথমে আমরা একটু সংবাদমাধ্যমে দেখব এই কারণে যে আমি নিজে সাংবাদিক, এটা আমি ভাল বুঝি আর এই কারণে বলছি দক্ষিণ এশিয়ার নানা দেশগুলোতে ---৯টা দেশে যে মহিলা সাংবাদিকরা আছেন—আমাদের একটা সংগঠন আছে। তার মাধ্যমে আমার একটা সুযোগ হয়েছে যে বস্তুত কেবল কাগজে পড়ে নয় বা

ইন্টারনেটে দেখে নয় বস্তুত অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোর মেয়েরা কেমন আছে সেটা তাদের মুখ থেকে শোনার। এক অর্থে আমার মনে হয় আমাদের এখানে বড্ড বেশি। মিডিয়াতে মেয়ে নেই কে বলল, সারাক্ষণ টিভি খুললেও মেয়ে আর রেডিও চালালেও মেয়েদের গলা, তাহলে মেয়ে নেই এটা আমরা কি করে বলছি। কিন্তু আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে মেয়েরা থাকলেও সেটা রয়েছে একেবারে মার্জিন-এ। বস্তুত তারা অনেকেই প্রায় দিন আনে দিন খায়-এর কাজ করে। ঠিকঠাক তারা মাইনে পায় না, তাদের যে কাজের পরিবেশ সেগুলো ভাল নয় তাদের পদোন্নতির, তাদের ওপরে ওঠার সুযোগ, কাজ করার যে ক্ষমতা সেটা তাদের অনেক কম। আপনারা শুনলে আশ্চর্য হবেন আমাদের এখনও শুধু ভারতবর্ষে নয় গোটা উপমহাদেশে নানা জায়গায় মেয়েরাও যে সব সংবাদ মাধ্যমের অফিসে কাজ করে, সেখানে এখনও মেয়েদের বাথরুম নেই। বিহারে, অসমে এটা দেখেছি। এটা আশ্চর্য হলেও সত্যি। এখন যে feminisation হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে সেটার একটা সমস্যা তো আপনারা জানেনই যে, যদিও মেয়েরা একটু আগের চাইতে বেশি আসছে তাহলেও প্রধান সমস্যা হল তারা এখনও সিদ্ধান্ত নেবার জায়গায় পৌঁছতে পারে নি। সুতরাং তারা যা বলছে মিডিয়াতে সেটা অনেকটাই অন্যদের ঠিক করে দেওয়া একটা ফ্রেম-এর মধ্যে কথা বলতে হচ্ছে। তার চাইতেও আমাকে অন্তত বেশি ভাবায় সেটা হচ্ছে যদি না আপনি বড় শহরগুলোতে এবং বড় কাগজ বা বড় টিভি চ্যানেলগুলোতে কিছু মেয়ে পাবেন। আপনি যত জেলার দিকে যাবেন যত গ্রামের স্তরে যাবেন আপনি মহিলা সাংবাদিক খুঁজে পাবেন না। আমাদের আনন্দবাজারে ডিস্ট্রিক্ট করেসপন্ডেন্টদের মধ্যে প্রায় মহিলা নেই। যদি বা যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যেও কিন্তু একেবারে রাজনীতির, একেবারে অর্থনীতি নিয়ে যারা কথা বলছে সেগুলোকে মনে করা হয় সাংবাদিকতা এবং রাজনীতির একেবারে মূল বিষয়ে তেমন মেয়ে খুবই কম। আমাদের প্রেস ক্লাবে শুধু রিপোর্টাররা মেম্বার হতে পারে। এখনও যাঁরা ডেস্ক-এ কাজ করেন তাঁরা অত বেশি হন না। কিন্তু ক্যালকাটা প্রেস ক্লাবে আপনারা দেখছেন যে মহিলা কত কম। যাঁরা actually reporting করেন তাঁদের মধ্যে খুব কমই মেয়ে আছেন। তাঁদের বেশির ভাগ কিন্তু ফিচার ধরনের লাইফ স্টাইল, ফিচার অথবা ডেস্ক-এ কাজ এগুলো বেশি করেন। তার মধ্যে সমস্যা কিছু আছে। তাঁরা ফিচার নিয়ে লিখতেই পারেন তাতে খারাপ কিছু নেই। কিন্তু যেগুলো হচ্ছে আর্টিকুলেশন-এর মূল জায়গা—নীতি, পলিসি, প্রকল্প সেখানে মেয়েদের গলা যথেষ্ট দৃঢ় নয়। রাইটার্স বিল্ডিং-এ খুব কম মেয়েই ঢুকতে পারছেন। আর একইভাবে যেটা আমাদের সি আই আই সেখানেও যাঁরা রয়েছেন তাদের তালিকায় সাংবাদিকের অর্থাৎ রাজনীতি-অর্থনীতর যেটা প্রাণকেন্দ্র সেখানে মেয়েদের voice খুব কম। যদিও মেয়েদের মুখ টিভির পর্দায় অনেক বেশি। এবারে আমরা অন্য দেশগুলোর কথাও দেখাই। ইনি রেহানা হাকিম, পাকিস্তানের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় সবাই তাঁর প্রতি খুব শ্রদ্ধাশীল। তিনি এ প্রশ্নটা তুলেছিলেন যে, আমাদের এত কম মহিলা মাত্র ৫% দেখা যাচ্ছে পাকিস্তানে, অথচ মনে রাখতে হবে যে উর্দু মিডিয়া কিন্তু ৮০% পাকিস্তানে। সেখানে কিন্তু মহিলা আরোই কম। এটা কিন্তু ভারতবর্ষেও সত্যি, বাংলাদেশেও সত্যি—সব জায়গায়। এই যে আমরা সবাই একটা ইংরেজের উপনিবেশ হয়েছিলাম, যারা ইংরেজি বলতে পারে তারা এখনও প্রথম শ্রেণীর নাগরিক এবং এই এর মধ্যে যখন মেয়েরা ঢুকতে পারে তখন মেয়েরা একটু বেশি সুযোগ সুবিধা পায়। যারা vernacular-এ লেখে সেটা পাকিস্তানের উর্দু কাগজ বা বাংলাদেশের বাংলা কাগজ বা আমাদের দেশে হিন্দি বা তামিল বা বাংলা মিডিয়াম, এমন কি একই হাউস একটা ইংরিজি কাগজ বার করছে আর একটা vernacular কাগজ বার করছে। অর্থাৎ এক অর্থে মাটির আরো কাছে আছে তাদের গলার স্বরটা উপরে উঠে আসার রাস্তাটা আরো অনেক বেশি আমাদের কাছে বন্ধ বলে মনে হয়, ঐ স্বরগুলো আমরা আরো কম শুনতে পাচ্ছি। কলকাতার একটি মেয়ে কী ভাবছে, কেমন আছে বোঝা সুবিধে। তমলুকের মেয়ে কেমন আছে, কোচবিহারের মেয়ে কেমন আছে জানা অনেক অনেক কঠিন। গুন্টুরের মেয়ে কেমন আছে জানা খুব কঠিন। রেহানা একটি প্রশ্ন তুলেছিলেন এটা কি শুধুই fictism নাকি মেয়েদেরও কোনও সমস্যা আছে। আমরা বারবার এ প্রশ্নটা তুলি কারণ আমরা মনে করি যে, মেয়েদের articulation-এর যে প্রশিক্ষণটা সেটাও ভাল হয় না। কিন্তু এর একটা সার্কেল আছে। কাজ করতে করতে শেখে, শিখলে আরও ভাল কাজ করে। সুতরাং কাজে ঢোকার entry point-এর একটা মাহাত্ম্য আছে। সেটাও ভুললে চলবে না। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও তাই, এ আর বলার কিছু নেই। নেপালের ক্ষেত্রেও তাই। এ বিষয়ে একটা সমীক্ষা ঘাঁটতে গিয়ে দেখেছি যে গ্লোবাল সমীক্ষা হয় সাউথ এশিয়া বলে খুব কমই হয়েছে, যাঁরা করছেন তাঁরা এশিয়া বলে করছেন। এশিয়ার চীনা বা কোরিয়া এগুলোতে মেয়ে সাংবাদিক বেশি বলে সার্বিক চিত্রটা খুব ভাল। যা আসে সেটা হচ্ছে তা ২০% women। এখন কিন্তু আমার মনে হয় না এ সমীক্ষাগুলো থেকে যে দক্ষিণ এশিয়াতে ঐ অনুপাতে মেয়ে রয়েছে। কেন মেয়েরা আসে না তার দুটো যেমন কারণ বললাম একটা ডাইরেক্ট থ্রেট আছে, আরেকটা তার প্রতি তাচ্ছিল্য। পেশাদার হিসাবে তাকে স্বীকার না করার একটা কারণ রয়েছে আর একটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট হ্যারাসমেন্ট। যেটা পুরুষ সাংবাদিকদের face করতে হয় কিন্তু মেয়েদের আরও বেশি face করতে হয়। এখানে আমরা দেখেছি এই মেয়েটি মালদ্বীপে।

এর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। এ মেয়েটিকে শ্রীলঙ্কা পালিয়ে যেতে হয়েছিল, শ্রীলঙ্কার রিফিউজি হতে হয়েছিল কারণ এর প্রথম সেটা ম্যাগাজিন—একটা নতুন মেয়েদের ম্যাগাজিন ও এডিট করতে শুরু করেছিল। এর সঙ্গে আরও দু'জন সঙ্গী মালদ্বীপের ডেলিগেশনে লাহোরে এসেছিল তার মধ্যে একজন প্রশ্ন তুলেছিল কেন সুনামি হওয়ার পর থেকে মালদ্বীপ-এর মেয়েদের ওপর বোরখা পরার জন্য বেশি চাপাচাপি করা হচ্ছে। তার জন্য তার deputation দাবি করা হচ্ছিল। আর একটি মেয়ে প্রশ্ন করেছিল— কেন এখনও চাবুক মারা চালু থাকবে, তার জন্য তার উপর এত চাপ এসেছিল যে তাকে লুকিয়ে পড়তে হয়েছিল। আর একটা জিনিস আমি নিজে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মেয়েদের নিয়ে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি, এটা অদ্ভুতভাবে অন্যান্য দেশের সঙ্গে নিয়ে, শুধু রাজ্য নয় সেটা হচ্ছে মেয়েরা ছদ্মনাম ব্যবহার করে। কত মেয়ে যে নিজের নাম ব্যবহার না করে একটা ছদ্মনাম লেখে। অর্থাৎ তার কণ্ঠটি যদি তাকে বাড়াতে হয় তার পরিচয়টাকে গোপন করতে হবে। এ এক অদ্ভুত শর্ত। এ কাজ যাকে করতে হয়, কী করে বলা যায় যে, সে ভাল আছে? যখন মেয়েরা সত্যি সাংবাদিক হিসেবে অন্য মেয়েদের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারে, তখন সংবাদে কি কিছু পরিবর্তন হয়? মেয়েদের সাংবাদিকতায় এসে বাস্তবিকই সাধারণভাবে মেয়েরা কি কিছুটা ভাল থাকে? এ প্রশ্নটা বারবার ওঠে। মেয়েরা না থাকার জন্য যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে সংবাদে বস্তুত আমরা মেয়েদের সম্পর্কে খুব কম খবর পাই। এমন কি ৪ জনে ১ জনও যাকে নিয়ে খবর হয়, তারা মেয়ে নয়। কিন্তু সেসব নিয়ে আমরা আর কিছু তথ্য দেখতে পারি সেটা হচ্ছে এটা সত্যি হলেও দেখা গেছে মেয়ে সাংবাদিকরা কিন্তু পুরুষদের চাইতে অন্তত মেয়েদের নিয়ে বেশি লেখে। Figure হচ্ছে ২৮% আর ২২%। মেয়েদের লেখার ২৮% ক্ষেত্রে মেয়েদের সমস্যা থাকে ছেলেদের ক্ষেত্রে ২২%। কিন্তু সেটা খুব বড়ো কথা নয়। কারণ এই ২৮% মেয়ে যে সব সময় নিজের ইচ্ছায় লিখছে, নিজের দায়বদ্ধতায় লিখছে তা তো নয়, স্বাভাবিকভাবেই মেয়েদের সম্পর্কে স্টোরি করতে হলে মেয়েদের পাঠানো হয়, মনে করা হচ্ছে যে দুটো বিষয় এখানে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। একটা হচ্ছে যদি একটা ক্রিটিক্যাল মা সাংবাদিকতায় আসে অর্থাৎ কোনও একদিন এমন হল ৩০% ছাড়িয়ে গেল অথবা ৩৫% অথবা ৪০%। একটা point আসবে। তারপরে দেখা যাবে মেয়েদের কথা অনেক বেশি উঠে আসছে, মেয়েরা কেমন আছে সেটা উঠে আসছে —এটা একদল মনে করেন। আরেক দল মনে করেন যত বেশি মেয়ে আসবে তত সম্ভাবনা বাড়বে যে উপরের স্তরেও মেয়েরা উঠবে, সিদ্ধান্ত নেবে, এডিটর হবে, চিফ রিপোর্টার হবে, নিউজ এডিটর হবে, তখন দেখা যাবে যে মেয়েদের কথা অনেক বেশি আসছে। এর মধ্যে কোনটা হতে চলেছে সেটা বোঝার মতো evidence এই মুহূর্তে আমাদের হাতে নেই, আর evidence ছাড়া science হয় না। সেজন্য আমি এর বেশি আর এই মুহূর্তে বলছি না। আমরা পরের প্রসঙ্গে যাব। এবারে আমরা আসছি দ্বিতীয় প্রসঙ্গে। সেটা হচ্ছে যে জনপ্রতিনিধি হিসেবে মেয়েরা, এখন এটা আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন এবং সবাই আমরা সাধারণভাবে জানি যে, সংসদগুলোতে মেয়েরা খুবই কম। এটা সাধারণভাবে গোটা বিশ্বে সত্যি আর দক্ষিণ এশিয়াতে তো বিশেষভাবে সত্যি। তাই বলার সময় বরং এভাবে প্রশ্নটা করা যেতে পারে যে সব ক্ষেত্রে, দক্ষিণ এশিয়ার বোধ হয় ৬টা দেশে কোনও না কোনও constitutional amendment হয়েছে যাতে করে মেয়েরা বিশেষভাবে জায়গা পেয়েছে প্রতিনিধি হিসেবে। যেমন আমাদের পঞ্চায়েতে সেখানে এতদিন আপনারা জানেন ৩৩ শতাংশ ছিল এখন সেটাকে বাড়িয়ে ৫০ শতাংশ করা হয়েছে। আগামী বছর থেকে ৫০ শতাংশ মেয়ে আমাদের রাজ্যে প্রতিনিধি হবে। তখন যে মেয়েরা আসছে তার যে মেয়েরা কেমন আছে, সেই কথাগুলো তুলে ধরতে পারছে? এ প্রশ্নটা খুব বেশি শুনতে হয় আমাদের। আনা তো হল মেয়েদের, তাতে হলটা কী? মেয়েদের কোনও উপকার হয়েছে কি মেয়েপ্রধান এসে? এটা থেকে একটা ভাল study বেরিয়েছে। আমাদের কিন্তু সাধারণ গ্রাম level-এ হচ্ছে রাম সিং-এর জায়গায় রাম সিং কি অওরত। মেয়েরা তো আসে না, মেয়েরা কথা বলে না, মেয়েরা মিটিং করে না; খালি সই করে দেয়, তাদের দেখা যায় না। কিন্তু এটা খুব important study। সেটা হয়েছিল এবং আরও পরে এই ধরনের অনেক study হয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে বস্তুত মেয়েরা, যখন তাদের প্রশ্ন করা হয়েছিল, গবেষকরা

আগামী বছর থেকে ৫০ শতাংশ মেয়ে আমাদের রাজ্যে প্রতিনিধি হবে। তখন যে মেয়েরা আসছে তার যে মেয়েরা কেমন আছে, সেই কথাগুলো তুলে ধরতে পারছে? এ প্রশ্নটা খুব বেশি শুনতে হয় আমাদের। আনা তো হল মেয়েদের, তাতে হলটা কী? মেয়েদের কোনও উপকার হয়েছে কি মেয়েপ্রধান এসে? এটা থেকে একটা ভাল study বেরিয়েছে। আমাদের কিন্তু সাধারণ গ্রাম level-এ হচ্ছে রাম সিং-এর জায়গায় রাম সিং কি অওরত। মেয়েরা তো আসে না, মেয়েরা কথা বলে না, মেয়েরা মিটিং করে না; খালি সই করে দেয়, তাদের দেখা যায় না।

গিয়ে প্রশ্ন করেছেন তোমরা কোনটাকে important বলে মনে কর। তখন তারা বলেছে যে, পশ্চিমবঙ্গে বলেছে যে, পানীয় জল আর রাস্তা। ছেলেরা অন্য ধরনের জিনিসকে বেশি মর্যাদা দিয়েছে। অর্থাৎ যত পুরুষ এগুলো চেয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি মেয়ে টিউবওয়েল এবং রাস্তা চেয়েছিল। আর রাজস্থানে কিন্তু জলটাই ছিল মেয়েদের প্রধান চাহিদা। পুরুষরা যত বেশি জল চাইছে তার চেয়ে অনেক বেশি মেয়ে খাবার জলকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। তারপর actual allocation পঞ্চায়েতে কী বরাদ্দ হয়েছে, কোন কাজের জন্য বরাদ্দ হয়েছে সেটা যেখানে রিজার্ভেশন হয়েছে আর যেখানে রিজার্ভেশন হয় নি —এ দুটো জায়গাতেই দেখেছিল গবেষকরা এবং দেখতে গিয়ে দেখেছেন বাস্তবে ঐ রাম সিং কি অওরত—যারা ঘোমটা টেনে থাকে, একটাও কথা বলে না, যারা কিছুই মনে হয় যে করতে পারল না, স্বামীর ছায়া হয়ে রইল। উপর থেকে দেখলে কিন্তু দেখা যাচ্ছে বস্তুত ওই মেয়েগুলো জলের জন্য এবং রাস্তার জন্য অনেক বেশি খরচ করেছে পশ্চিমবঙ্গে পুরুষ প্রধানদের চাইতে এবং রাজস্থানে স্পষ্টত জলের জন্য তারা অনেক বেশি খরচ করেছে পুরুষ প্রধানদের চাইতে। অর্থাৎ তারা যেটা নিজেদের preference বলে জানিয়েছিল দেখা গিয়েছে যে সে তার ক্ষমতা ব্যবহার করেছে সে preference-কে public life-এ প্রাধান্য দিতে। অর্থাৎ এখানে বস্তুত জনপ্রতিনিধি করা মেয়েদের একটা ক্ষমতায়ন যে হয়েছে তার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। হয়ত অনেক কাজ তারা করতে পারে নি, হয়ত সে এখনও বাড়িতে মার খায়, হয়ত সে একা বেরোতে পারে না, হয়ত তার এখনও অনেক অক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু এই কাজটুকু সে পেরেছে। এর পরের বিষয়টাতে আমরা যাব সেটা হচ্ছে আমার বিশেষ আগ্রহের বিষয়। কারণ মেয়েদের এখানে কণ্ঠস্বর শোনা অর্থাৎ সরাসরি সে কী মনে করে সেটা তার বলা একেবারে grass roots-এর মেয়ে যার প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনীতিতে আসার কোনই প্রায় সম্ভাবনা বা সম্ভাবনা খুব কম অথবা যা লেখালেখি বা টিভির মাধ্যমে বক্তব্য প্রকাশের সম্ভাবনা কম, সৃজনমূলক কাজ করারও সম্ভাবনা কম, সেই মেয়েটির কণ্ঠ শোনার, সে কেমন আছে তা বোঝার একটা অসামান্য সুযোগ কিন্তু ভারতবর্ষে তৈরি হয়েছিল। ৭২তম সংবিধান সংশোধন করে আমরা বলেছিলাম যে, প্রতিটা গ্রামে আমাদের বছরে অন্তত একবার একটা গ্রামে সভা হবে সেখানে যে কোনও ভোটাধিকার প্রাপ্ত লোক এসে কথা বলতে পারবে। আমরা প্রায়ই খেয়াল করি না যে বিশ্বের ইতিহাসে direct democracy নিই, এত বড়ো এক্সপিরিমেন্ট কখনও হয় নি। ২ লক্ষ গ্রামে একই সঙ্গে এতগুলো লোক এসে বহু বহু মানুষ এসে একটা প্রায় অকল্পনীয় একটা ডাইমেনশন এই ডেমোক্রেসির। কিন্তু সেখানে কান পাতার প্রয়োজনও আমরা অনুভব করি না আমরা বেশি। সেখানে কে কী কথা বলছে আমরা বিশেষ শুনি না। আর সেখানে মেয়েরা কী বলছে এটা তো একটা কৌতূহলের বিষয় তো বটে!

যখন গিয়ে মেয়েরা কথা বলছেন আমরা বীরভূমের ৪৪টা সভার থেকে নিয়েছিলাম। তখন একটা জিনিস স্পষ্ট যে, মেয়েরা কম কথা বলে। কম মেয়ে কথা বলে। যখন মেয়েরা কথা বলছে প্রধান হিসেবে তখন গোড়ার দিকে যে প্রধানরা একটা speech দেন সেটাতে তাঁরা অনেক সংক্ষিপ্ত, অল্প কথা বলছে। ছেলেরা কথা বলছে অনেক বেশি। আর যদিও আমরা দেখি মেয়েরা কী ধরনের কথা বলতে চাইছে সেখানেও আমরা দেখি কখন মেয়েরা বেশি কথা বলছে। কী ধরনের ফ্যাক্টর সাহায্য করছে মেয়েদের উঠে এসে নিজেদের কথা নিজেরা বলার। তখন আমরা দেখেছি ছেলে প্রধান না মেয়ে প্রধান সেটা একটা বড় ফ্যাক্টর হচ্ছে না। কিন্তু যেখানে অনেক মেয়ে আছে সভাতে, যদি দেখি ৩০ শতাংশের বেশি মেয়ে আছে, তাহলে দেখা যাচ্ছে মেয়েরা অনেক কথা বলছে। এবং শুধুমাত্র ব্যক্তিগত চাহিদার কথা বলছেন না। গ্রামের কী চাহিদা, কী সমস্যা সেটা নিয়ে অনেক কথা বলছে।

যখন গ্রামসভাগুলোতে কথা হয় তখন এটা একটা অসামান্য পরিসর তৈরি হয়, যেখানে রাষ্ট্রর সঙ্গে নাগরিকের সরাসরি একটা দরদস্তুর হয়। আমার কী পাওয়ার আছে সেটা আমি বুঝে নেব আর রাষ্ট্র তখন প্রায় সময় সে পুরুষের মধ্যে দিয়ে বলুক বা নারীর মধ্য দিয়েই বলুক সে নাগরিকের অধিকারকে বাঁধতে চায়। এটা যাকে বলা স্ট্রাগল্। আমি যতদূর খেলতে পারি, আমি কোথায় তোমাকে রুখতে পারি। প্রায় সময়ই মেয়েদের ক্ষেত্রে বিশেষত যেটা একটা খুব সনাতন ধাঁচা। এ রকম ধরনের পরিবার হবে এবং এ ধরনের পরিবারকেই গ্রাহ্য করা হবে সেটা রাষ্ট্র চাপাতে চায় আর মেয়েরা তার খারাপ থাকা, তার কষ্টে থাকা সেটাকে বড়ো করে বলে সেটাকে আরও দৃঢ় করতে চায়। অন্ধ্রপ্রদেশের একটি গ্রামে সাবিত্রী বলে একটি দলিত মেয়ে সে বলছে, আমার স্বামী নেই। আমার একটা বাচ্চা। খুব কষ্ট। আমার ৬ মাস বাড়ি ভাড়া বাকি পড়েছে। আমার একটা বাড়ি দরকার। তখন যে পুরুষ প্রধান সে বলছে তুমি নিজে থেকে তোমার স্বামীকে ছেড়ে চলে গেছ, স্বামীর সঙ্গে তুমি ঝগড়া করেছ। এখন তোমার জন্য কোনও বাড়ি নেই। যদি আসে পরে তখন তোমাকে বাড়ি দেওয়া হবে। পশ্চিমবঙ্গে একটি মেয়ে, অবশ্য তার জাতটা আমরা জানি না, সেই মেয়েটি বলছে, আমি গমও পাই নি, আমি শাড়িও পাই নি। আমার অনেক বয়স হয়েছে। কে আমাকে এসব দেবে? তখন যে প্রধান তিনি মহিলা এবং তিনি general caste। তিনি বলছেন, তোমার কী ছেলে আছে? বৃদ্ধা বলছেন, আছে। তোমার কী বর্গাদারিতে কোনও জমি আছে? আছে, কিন্তু ছোট জমি।

তাহলে কী তোমার মতো লোককে সরকার দেখবে? সকলকে কী সরকার দেখবে? বৃদ্ধা বলছেন, কেন দেখবে না। আমার জমিতে যা ধান হয় তাতে আমার একমাসও চলে না। প্রধান বলছে, তোমার ছেলে যদি তোমাকে না দেখে, তাহলে কে দেখবে? এই যে পুরো জিনিসটা structure করা হচ্ছে তার মধ্যে সে একজন মহিলা তার খারাপ থাকাটা তখনই গ্রাহ্য হবে, বস্তুত তার পরিবার তার প্রয়োজন পূরণ করতে পারছে না এই জিনিসটা সে প্রমাণ করতে পারে। তার destitution state-এর কাছে হচ্ছে সবচেয়ে important evidence যে তার নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের কাছে তার প্রাপ্য কোনও কিছু থাকতে পারে।

সেজন্য আমরা দেখি যে প্রায় সময় এই সব জায়গায় যদি কখনও গিয়ে আমরা শুনি মেয়েরা কী বলছে, আমরা শুনবো বারবার তারা তাদের ছোটখাটো চাহিদার কথাই বলছে। আমার একটা বাড়ি দাও, আমার অমুকটা নেই আমাকে দাও, তুমি যদি আমাকে না দাও আমাকে কে দেবে। আমাকে দেখার কেউ নেই। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে, আমরা তো ক্ষমতায়নের পথে হাঁটছি না। এই যে সারাক্ষণ খারাপ থাকার একটা rhetoric,কষ্টের rhetoric, destitution-এর rhetoric এটা দিয়ে একটা মেয়ে ক্ষমতায়নের দিকে কতটা হাঁটতে পারবে। কী করে সে ভাল থাকার দিকে এগোতে পারবে। কিন্তু কথা হল যে আমাদের per-spective টা ভুললে চলবে না। আমাদের রাষ্ট্রই এমন একটা প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্র তৈরি করেছে যেখানে একটা মেয়ের কাছে তার অভীষ্ট পাওয়ার জন্য এ ভাবে নিজেকে দেখাতে হচ্ছে যে, আমি খারাপ আছি। আমার কষ্ট অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি। তাই তোমার কাছে আমার চাহিদার গুরুত্ব সবার চাইতে বেশি। এটা একটা competition of destitution। এটা রাষ্ট্রের শর্ত মেনে মেয়েরা এইভাবে তাদের rhetoric টা তৈরি করছে। ফলে আজকে মেয়েদের ভাল থাকার উপায় তাই আরো বেশি করে খারাপ থাকার evidence রাষ্ট্রের সামনে তুলে ধরা।

আমাদের দারিদ্র্যের মাপ, আমাদের বার্ধক্যের মাপ সেই কথা ভেবেই তৈরি করা হয়। আমরা যখন গ্রামে গিয়ে মেয়েদের জিজ্ঞাসা করি, তোমার বয়স কত গো? শোন, তুমি লেখ ৫৮ হয়ে গেছে। যাঃ, তোমার তো একটা চুলও পাকে নি? না না, লেখ না, আমার কেউ নেই, আমাকে দেখার কেউ নেই। মানে আমি যেন তাড়াতাড়ি কোনওভাবে বার্ধক্য ভাতাটা পাই। আমার বাড়িতে সাইকেল আছে, তুমি কিন্তু লিখো না। আমার বাড়িতে ট্র্যানজিস্টর আছে, ওটা কিন্তু চলে না। দরিদ্র হিসেবে জায়গা পাওয়ার জন্য এ আকুলতা, এ উদগ্রীব থাকা। এটা কিন্তু তাকে ছোট করছে না। বরং আমি বলব একটা অদ্ভুত inversion হচ্ছে। আমাদের জনসমাজে যদি দেখেন যে, শিয়রের দিক থেকে কী ভাবা হয়েছিল, ভাবা হয়েছিল এ ধরনের প্ল্যাটফর্ম তৈরি হবে, সেখানে মেয়েরা আসবে। মেয়েরা পরিবারের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে একটা জনবৃত্তে আসবে। তারা বাড়ির বৌ, বাড়ির মেয়ে না থেকে নাগরিক হয়ে উঠবে। এবং নাগরিক হিসেবে তারা সবার সঙ্গে, রাষ্ট্রের সঙ্গে এবং সমাজের সকলের সঙ্গে কথা বলবে। এইভাবে চলবে। হচ্ছে কী? ঠিক তার উল্টোটা। মেয়েরা রাষ্ট্রকে পরিবারের বৃত্তের মধ্যে নিয়ে আসছে। আমার ছেলে নেই, তোমাকে দিতে হবে। আমার স্বামী নেই, তুমি পঞ্চায়েত প্রধান তোমাকে দিতে হবে। এ destitution-এর rhetoricটা মেয়েদেরকে চালিত করছে অন্যভাবে, রাষ্ট্রকে তার কাছে দায়বদ্ধ করার, যাতে রাষ্ট্র তার খারাপ থাকাটাকে অবজ্ঞা না করে অন্যদের ভাল থাকার ব্যবস্থা করতে না পারে।

উমা

Declaration

বিধিসম্মত ঘোষণা

প্রকাশক	:	বরুণ ভট্টাচার্য (সা.)
জাতি	:	ভারতীয়
ঠিকানা	:	বি ডি ৪৯৪, সল্ট লেক, কলকাতা ৭০০০৬৪
প্রকাশস্থান	:	ঐ
স্বত্বাধিকারী:		সচিব, 'উৎস মানুষ' সমিতি (বরুণ ভট্টাচার্য)
ঠিকানা	:	বি ডি ৪৯৪, সল্ট লেক, কলকাতা ৭০০০৬৪
মুদ্রক	:	বরুণ ভট্টাচার্য
মুদ্রণস্থান	:	শান্তি মুদ্রণ, ৩২/৩, পটুয়াটোলা লেন,কলি-৯
সম্পাদক	:	সমীরকুমার ঘোষ (সা.)
জাতি	:	ভারতীয়
ঠিকানা	:	ঐ

আমি এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরিউক্ত তথ্যগুলি আমার বিশ্বাস ও জ্ঞানানুসারে সত্য।

স্বাঃ বরুণ ভট্টাচার্য
প্রকাশক

চাই না বিষ-ফসল

সুনীতিকুমার মণ্ডল

জিনগত পরিবর্তন ও জিএম ফসল

জীবের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে জিন এবং সাধারণভাবে জিনের প্রকৃতি খুব সহজে পরিবর্তিত হয় না। জীবের বৈশিষ্ট্যও তাই একই রকম থাকে। সহজে হয় না ঠিকই কিন্তু নতুন প্রজাতি ও জাতের আবির্ভাবের সঙ্গে জিনের পরিবর্তন, সংযোজন, বিয়োজন ইত্যাদির গভীর সম্পর্ক আছে। প্রকৃতির কোলে বেড়ে-ওঠা উদ্ভিদের মধ্যে স্বাভাবিক নিয়মেই জেনেটিক বস্তুর সংযুক্তি ঘটে এবং ঘটেছে। এ ভাবেই গম, তুলো (New World Cotton) ইত্যাদির মতো বহু রকমের কৃষি উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়েছে। প্রাথমিক অবস্থায় মানুষ প্রকৃতি থেকেই পছন্দ মতো কৃষি উদ্ভিদ বেছে নিয়েছিল। পরবর্তীতে দীর্ঘ সময় ধরে প্রয়োজন ভিত্তিক বাছাই এর মাধ্যমে উদ্ভিদের বিকাশ ঘটেছে।

১৯০০ সালে গ্রেগর জোহান মেন্ডেলের বংশগতি সূত্রের পুনরাবিষ্কারের পর সংকরায়ণের পদ্ধতি ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। গত শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে কৃষি ও উদ্যান উদ্ভিদ, মুরগি ও গো-পালনের ক্ষেত্রে উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে সংকরায়ণের কৌশল পৃথিবীর নানা দেশে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ হতে থাকে। কৃষি উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এর সফলতার ফলেই 'সবুজ বিপ্লব' সম্ভব হয়েছিল এবং বিভিন্ন ফসলের সংকর জাতগুলি (বিশেষ করে বেঁটে উচ্চ ফলনশীল গম ও ধান) কৃষি উৎপাদনকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে দিতে পেরেছিল। খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে সংকর জাতের বীজ এবং উন্নত চাষ পদ্ধতির জন্যে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে খাদ্য উৎপাদনের ঘাটতি পূরণ হয়েছে।

সংকরায়ণে নতুন জিনের মাধ্যমে নতুন বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ঘটে এবং পিতা মাতার কাছ থেকে সেই জিন অপত্যের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়। প্রতি বছর কৃষি ও উদ্যান উদ্ভিদের ক্ষেত্রে শত শত যে সব জাতের সৃষ্টি হয় সেগুলি সবই প্রথাগত সংকরায়ণ করেই হয়। কাছাকাছি জাতের উদ্ভিদের বিশেষ কোনো পছন্দের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণের জিন যৌন জননের মাধ্যমে অন্য জাতের উদ্ভিদে স্থানান্তরিত করে আকাঙ্ক্ষিত উদ্ভিদ তৈরি হয়। এ ক্ষেত্রেও উদ্ভিদের জিনগত পরিবর্তন ঘটে কিন্তু জিনগুলি আসে তারই কোনো নিকট আত্মীয়ের কাছ থেকে।

জিন পরিবর্তিত জীব বা জি এম ও (জেনেটিক্যালি মডিফায়েড অর্গানিজম), নিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী বিতর্ক চলছে, তৈরি হয়েছে বা হচ্ছে জিন প্রযুক্তি বা রিকমবিন্যান্ট ডি এন এ টেকনোলজির সাহায্যে, যেখানে যৌনজনন বা পরাগ মিলনের কোনো ভূমিকা নেই। জিন পরিবর্তিত ফসল (জেনেটিক্যালি মডিফায়েড কর্প, সংক্ষেপে জি এম।) এর ক্ষেত্রে পছন্দের জিনগুলি নির্দিষ্ট ফসলে সরাসরি জিন প্রযুক্তির সহায়তায় প্রবেশ করানো হচ্ছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে জিনগুলি অন্য প্রজাতির উদ্ভিদ থেকে, অন্য গণের উদ্ভিদ থেকে, ব্যাকটেরিয়া থেকে কিংবা কোনো প্রাণী থেকে নেওয়া হচ্ছে। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে ফসলের মধ্যে ঐ সব জিনের সংযুক্ত হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই --- যেমন ব্যাকটেরিয়ার জিন ধান, সয়াবিন, ভুট্টা, তুলো ইত্যাদিতে; ড্যাফোডিল ফুল গাছের জিন যুক্ত হয়েছে ধানে; মেরু অঞ্চলের বোয়াল জাতীয় মাছের জিন যোগ করা হয়েছে টমেটোয়। তাই জিন পরিবর্তিত ফসলে এমন সব নতুন জিন যুক্ত হয়েছে যা ঐ সব ফসলে ছিল না, আমাদের দেহে সেসব যাবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না এবং পরিবেশেও ঐ জিন সমন্বয় একেবারে নতুন। জি এম ফসলে সংযুক্ত জিন মানুষের শরীরে এবং পরিবেশে কী প্রতিক্রিয়া ঘটাবে জানা নেই। বিপদের আশঙ্কা সেই কারণেই।

জিন পরিবর্তিত ফসল

১৯৫৩ সালে ডি এন এ-র দ্বিতন্ত্রী গঠন আবিষ্কার (ওয়াটসন ও ক্রিক) ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব আবিষ্কারের মতোই গুরুত্বপূর্ণ এবং জীব বিজ্ঞানের পট পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণ। এর পর জীব বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্র ক্রমশ মলিকুলার বায়োলজি ও মলিকুলার জেনেটিকস-এর দিকে সরে যায় জিন, ডি এন এ, তার কাজের ধরণ এবং জীবের সঙ্গে সে সবের সম্পর্ক সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে গিয়ে জিন্ প্রযুক্তির (জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং) সূচনা হয়। কয়েক বছরের মধ্যেই এই শাখাটি খুবই সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে এবং এক জীব থেকে প্রয়োজনীয় জিন অন্য জীবে স্থানান্তরের মতো জটিল প্রক্রিয়াও অনায়াসসাধ্য হয়ে ওঠে। ১৯৭০ দশকের মাঝামাঝি থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতোই এই প্রযুক্তি কৃষি উদ্ভিদের উন্নয়নের জন্যে কাজে লাগানো শুরু হয়।

কৃষি-উদ্ভিদে নাইট্রোজেন সংবন্ধনের জিন যোগ করার প্রচেষ্টা জি এম ফসল সংক্রান্ত একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ধান, গম, ভুট্টা,

আলু ইত্যাদি প্রধান খাদ্য উদ্ভিদগুলির চাষে প্রচুর নাইট্রোজেন সার লাগে। বাতাসে ৭৮.০৮ শতাংশ নাইট্রোজেন কিন্তু শিম জাতীয় উদ্ভিদ ছাড়া সেই নাইট্রোজেন কাজে লাগানোর ব্যবস্থা অন্য কোনো উদ্ভিদের নেই। অনেক ব্যাকটেরিয়া আছে যারা বাতাসের নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে পারে। এই কাজের জন্যে তাদের বিশেষ জিন আছে তার নাম 'নিফ্' জিন। *ক্লেবসিয়েলা* ব্যাকটেরিয়ার নিফ্ জিন অন্য উদ্ভিদে প্রতিস্থাপনের চেষ্টা হয়েছিল ১৯৭০ দশকের মাঝামাঝি। কিন্তু শেষ পর্যায়ের জিন স্থানান্তরের কাজে কিছু সমস্যার জন্যে বিষয়টি গবেষণাগারের মধ্যেই থেকে গেছে। নিফ্ জিন স্থানান্তরে সফল হওয়া যায় নি কিন্তু পরবর্তী সময়ে অন্য ফসলের ক্ষেত্রে জিন প্রযুক্তি দারুণভাবে সফল। সরকারি প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়ে এ কাজ হলেও বাণিজ্যিকভাবে জি এম ফসলের বীজ তৈরির ক্ষেত্রে আমেরিকার বীজ ব্যবসায়ীদের ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। জি এম ফসলের বীজ বাণিজ্যিকভাবে চাষ শুরু হয়েছে ১৯৯০-এর দশকে। বিশ্বজুড়ে প্রচুর টমেটো চাষ হয়। এর অনেক জাত। টমেটো চাষের সব চেয়ে বড় অসুবিধা, পাকা ফল নরম হয় বলে পরিবহনে প্রচুর নষ্ট হয়। যে উৎসেচকের প্রভাবে পাকা ফল নরম হয় তার জিনকে কাজ করতে বাধা দেবার জন্যে অ্যান্টিসেন্স আর এন এ যোগ করে তৈরি হয়েছিল *Flavr-Savr টমেটো* —পৃথিবীর প্রথম জি এম ফসল। তৈরি হয়েছিল Calgene। বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্যে এই জাত আমেরিকার মাঠে নেমেছিল ১৯৯৪ সালে।

রোগ-পোকা কাবু করতে পারে না এমন ফসলের খুবই কদর। জেনেটিক প্রযুক্তির সাহায্যে তৈরি কীটপতঙ্গ প্রতিরোধী ফসল সেই কারণেই উল্লেখযোগ্য। আমেরিকায় কেবল স্টেম বোরারের আক্রমণে এক বিলিয়ন (শতকোটি) ডলার মূল্যের ভুট্টা নষ্ট হয়। এই পোকা ভুট্টার কাণ্ড ফুটো করে গাছ মেরে ফেলে। বিভিন্ন জাতের *ব্যাসিলাস থুরিনজিয়েনসিস* ব্যাকটেরিয়ার দেহে যে বিষ তৈরি হয় সেগুলি বিভিন্ন জাতের পতঙ্গকে মেরে ফেলতে পারে। একটি জাত ভুট্টার স্টেম বোরারকেও মারতে পারে। ভুট্টার স্টেম বোরার দমনের জন্যে এক সময় ঐ ব্যাকটেরিয়ার স্পোর এবং টক্সিন বায়োপেস্টিসাইড হিসেবে প্রয়োগ করা হতো। জেনেটিক প্রযুক্তির সাহায্যে *ব্যাসিলাস থুরিনজিয়েনসিসের* বিষ তৈরির জিনটি ভুট্টার মধ্যে চালান করে পতঙ্গ প্রতিরোধী ভুট্টার জাত তৈরি হয়েছে; নাম দেওয়া হয়েছে বি টি কর্ন। এই জাতের ভুট্টার গাছ খেয়ে স্টেম বোরার বাঁচে না। আমেরিকার চাষীরা খুব আগ্রহের সঙ্গে একে গ্রহণ করেছিল। বি টি ভুট্টা বীজের চাহিদায় উৎসাহিত হয়ে বড় বড় বীজ প্রতিষ্ঠানগুলি সয়াবিন, কার্পাস, সেলারি, সুগারবিট ইত্যাদি বহু ফসলের পতঙ্গ প্রতিরোধী জাত তৈরি করে। শুধু তাই নয়, ভাইরাস প্রতিরোধ করার জিন ও অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ করার জিন যুক্ত উদ্ভিদও তৈরি হয়।

চাষ জমির আগাছা নির্মূল করার খরচ কমাতে ইওরোপ, আমেরিকায় বহুদিন থেকেই আগাছা নাশক রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার হয়ে আসছে। কিন্তু এর সীমাবদ্ধতা আছে। কারণ অনেক ফসলের ঐ রাসায়নিক পদার্থ সহ্য করার ক্ষমতা নেই। এ রকম ফসলে জিন প্রযুক্তির সাহায্যে আগাছা নাশক সহ্য করার ক্ষমতা সম্পন্ন জিন জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে আগাছা নাশক সহ্য করতে পারত না এমন ফসলেরও আগাছা নাশক প্রতিরোধী জাত তৈরি হয়েছে। সে সব জাতের চাষে আগাছা নাশক প্রয়োগ করা যায় ফলে চাষের খরচ কমে। কীট পতঙ্গ প্রতিরোধী ফসলের মতোই আগাছা নাশক প্রতিরোধী ফসলগুলিও চাষীরা সাদরে গ্রহণ করেছিল।

বেশি পুষ্টি সমৃদ্ধ ফসল তৈরির জন্যেও এই প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো হয়েছে। তৈরি হয়েছে ভিটামিন ডি তৈরির জিন যুক্ত সয়াবিন। ভিটামিন এ-র উৎস বিটা ক্যারোটিন তৈরির জিন ধানে জুড়ে দিয়ে তৈরি হয়েছে সোনালী ধান (গোল্ডেন রাইস)। রকফেলার ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় আট বছর গবেষণার পর ১৯৯৯ সালে প্রথম সোনালী ধান তৈরি হয়। তাতে বিটা ক্যারোটিন তৈরির জন্যে যে তিনটি জিন যোগ করা হয়েছে তার দুটি নেওয়া হয়েছে ড্যাফোডিল ফুলের গাছ থেকে এবং একটি নেওয়া হয়েছে *Erwinia uredovora* নামের মাটিতে বসবাসকারী ব্যাকটেরিয়া থেকে। পরবর্তী সময়ে সরষেরও ভিটামিন এ তৈরির ক্ষমতা সম্পন্ন জাত তৈরি হয়েছে।

বহু রকম খাবার তৈরিতে টমেটোর শাঁস ব্যবহার হয়। সেই শাঁস বা পেস্ট ফ্রিজে রাখলেও নরম থাকবে এমন হলে খুবই সুবিধা। বরফ ঢাকা মেরু অঞ্চলের মাছের দেহের তরল অংশ যাতে জমে না যায় তার জন্যে তাদের দেহে অ্যান্টিফ্রিজ প্রোটিন থাকে। টমেটোর মধ্যে সে রকমই অ্যান্টিফ্রিজ প্রোটিনের জিন যুক্ত করে যে জাত তৈরি হয়েছে তার শাঁস ফ্রিজে রাখলেও জমে না। আরো বহু বিচিত্র জিন যুক্ত জি এম ফসল তৈরি হয়েছে এবং ১৯৯৪ থেকে এখন পর্যন্ত ১৮ বছরে টমেটো, ভুট্টা, সয়াবিন, কার্পাস, লেটুস, আলু, সেলারি, ধান সরষে, রাই, সূর্যমুখী, গাজর, তামাক, স্ট্রবেরি, আপেল, বেগুন সহ পঞ্চাশ রকমের বেশি ফসল

ও ফলের জি এম জাত তৈরি হয়েছে। অবশ্য এর সবগুলিই যে বাণিজ্যিকভাবে চাষ হচ্ছে তা নয়।

ভারতে কী হচ্ছে?

ভারতে জি এম ফসলের চাষ শুরু হয়েছিল বি টি কার্পাস (তুলো) দিয়ে। আমেরিকার বহুজাতিক সংস্থা মনসান্টো এ দেশে বি টি তুলোর বীজ এনেছিল ১৯৯৫ সালে এবং বেআইনিভাবে বীজ বাড়ানো চলছিল। সে সময় শিবসেনার নেতৃত্বে প্রবল বিরোধিতা হয়েছিল এবং অনেক তুলোর জমি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ কী এক জাদুতে সব কিছু থেমে যায় এবং ২০০২ সালের মার্চ মাসে বি টি তুলো বাণিজ্যিক চাষের সরকারি অনুমোদন পেয়ে যায়, কেন্দ্রে তখন বিজেপির নেতৃত্বে এন ডি এ সরকার। বি টি তুলো চাষের ফলাফল খুবই খারাপ হয়েছে, চাষীদের সর্বনাশ হয়েছে, বহু চাষী এর জন্যে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে এবং হচ্ছে। বি টি তুলো নিয়ে এমন ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা হওয়া সত্ত্বেও বি টি বেগুনের মতো স্বাস্থ্য ও পরিবেশের ক্ষতিকর একটি জি এম ফসল এ দেশের চাষীদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার সরকারি তৎপরতা অত্যন্ত বিস্ময়ের এবং দুর্ভাবনার। কারণ এ দেশে পাঁচ লক্ষ দশ হাজার হেক্টর জমিতে বছরে ৮২ লক্ষ টন বেগুন উৎপন্ন হয় যা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি (বিজনেস ইকনমি, ১৬.০১.২০১০)। দু'হাজারের বেশি জাতের বেগুন চাষ হয় এখানে এবং তার মধ্যে পোকা লাগে না এমন অনেক জাতও আছে।

জিন পরিবর্তিত বি টি বেগুনে পোকা লাগে না। বি টি ভুট্টা, বি টি তুলোর মতোই কাণ্ড ও ফল ফুটো করে দিতে পারে এমন পোকা দমনের জন্যে ব্যাসিলাস থুরিনজিয়েনসিস ব্যাকটেরিয়ার বিষ তৈরির জিন (Cry1Ac) প্রতিস্থাপন করে তৈরি হয়েছে বি টি বেগুন। ব্যাসিলাস থুরিনজিয়েনসিসের জিন যুক্ত অন্য ফসলের মতো এ ক্ষেত্রেও ফসলের নামের সঙ্গে বি টি যুক্ত করে বেগুনের নাম হয়েছে বি টি বেগুন। মনসান্টোর ভারতীয় এজেন্ট মাহিকো (Mahyco-Maharastra Hybrid Seed Company) এই জাতটি এ দেশেই তৈরি করেছে এবং বাণিজ্যিকভাবে চাষের চেষ্টা করছে। দাবি করা হচ্ছে এই বেগুনে পোকা লাগবে না, তাই উৎপাদন বাড়বে, চাষীদের লাভ হবে। তা ছাড়া বেগুন চাষে পোকা মারার জন্যে যে সব বিষ দিতে হয় বি টি বেগুনে তা লাগবে না বলে স্বাস্থ্য ও পরিবেশের ক্ষতি হবে না। কিন্তু এই বেগুনের মধ্যেই তো বিষ রয়েছে, তাই এই দাবিগুলির যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন থেকে যায়।

আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয়েছিল জি এম ফসল চাষের ক্ষেত্রে যথাযথ পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং সাবধানতা নেওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং তা দেখার জন্যে সব দেশে সরকারের উপযুক্ত পরিকাঠামো থাকা দরকার। ভারতে এর জন্যে ১৬ সদস্যের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপ্রুভাল কমিটি (সংক্ষেপে জি ই এ সি) আছে। এই কমিটি ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বরে মাহিকোকে বি টি বেগুনের পরীক্ষামূলক চাষের অনুমোদন দিয়েছিল এবং সে সময় এর বাণিজ্যিক চাষের অনুমোদনের সম্ভাব্য সময় ধরা হয়েছিল ২০০৯ সাল। জি ই এ সি ১৪ই অক্টোবর ২০০৯-এর মিটিং-এ বি টি বেগুনের বাণিজ্যিক চাষের জন্যে সুপারিশ করে এবং অনুমোদনের বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রকের ওপর ছেড়ে দেয়। কমিটির সুপারিশের বিষয়টি প্রচারিত হবার পরই সারা দেশ জুড়ে বি টি বেগুনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায়। বেগতিক দেখে ৯ই ফেব্রুয়ারি ২০১০ কেন্দ্রীয় পরিবেশ ও বনমন্ত্রী জয়রাম রমেশ বাণিজ্যিকভাবে বি টি বেগুন চাষের অনুমোদন স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করতে বাধ্য হন।

২০০৬ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর ভারতের সুপ্রিম কোর্ট নতুন কোনো জি এম ফসলের ফিল্ড ট্রায়ালের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। বি টি বেগুনকে সরকারি ছাড়পত্র দেবার জন্যে হঠাৎ সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হলো ২০০৮-এর ফেব্রুয়ারিতে। তাই ভারতে বি টি বেগুনের বাণিজ্যিক উৎপাদনের চেষ্টা অব্যাহত রাখাতে কোনো বাধা নেই। মাহিকো এর জন্যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছে, তারা সহজে হাল ছেড়ে দেবে বলে মনে হয় না। এ রকম আশঙ্কার কারণ বি টি বেগুনের বাণিজ্যিক উৎপাদনের অনুমোদনের জন্যে যা ঘটেছে তা অত্যন্ত লজ্জার ও উদ্বেগের। জি এম ফসল চাষ হবে কী না এই সিদ্ধান্ত নেবার কথা জি ই এ সি-র। বি টি বেগুন তৈরি করেছে মাহিকো এবং জি ই এ সি-র ছ'জন সদস্য কোনো না কোনো ভাবে মাহিকোর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই ছ'জন সদস্যের কাছে নিরপেক্ষ মতামতের চেয়ে মাহিকোর স্বার্থরক্ষার বিষয়টি বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। তাঁদের অতি তৎপরতায় মিটিংয়ে অন্য সদস্যের মতামত অগ্রাহ্য করে, যথাযথ পরীক্ষা নিরীক্ষা না হওয়া সত্ত্বেও বি টি বেগুনের বাণিজ্যিক চাষের সুপারিশ করা হয়েছিল। জি ই এ সি-র কাজকর্ম নিয়ে আগেই নানা রকম অভিযোগ উঠেছিল বলে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তিন জন বিজ্ঞানীকে পর্যবেক্ষক হিসেবে কমিটির সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। তাঁদের একজন 'সেন্টার ফর সেলুলার অ্যান্ড মলিকিউলার বায়োলজি'-র প্রাক্তন অধ্যাপক পি ভার্গব। তিনি জি ই এ সি-র তৈরি ১০২ পৃষ্ঠার প্রতিবেদন দেখতে মাত্র একদিন সময় দেওয়ার জন্যে এবং

প্রতিবেদনে বহু অসঙ্গতি ও অবৈজ্ঞানিক তথ্য থাকার জন্যে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে, প্রতিবেদনটি আরো সময় নিয়ে বিশেষজ্ঞরা যাতে দেখতে পারেন তার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু সে সব গ্রাহ্য হয় নি। আসলে আগে থেকে ঠিক হয়েই ছিল ১৪ অক্টোবরের (২০০৯) মিটিংয়ে কী হবে। মাহিকোকে ভারতে বি টি বেগুন নিয়ে বাণিজ্য করার সুযোগ করে দেবার জন্যে মাহিকোর সঙ্গে জড়িত সদস্যদের বিশেষ তৎপরতা ছিল এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রকের মদত ছিল। এ কী কেবল মনসান্টোকে বাণিজ্যের সুযোগ করে দিয়ে আমেরিকার কাছে আনুগত্য প্রকাশ, না কি আরো কিছু?

ভারতে জি এম ফসলের বিরোধিতা হয়েছে প্রথম থেকেই তাও বি টি তুলো চাষের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, বি টি বেগুন চাষের অনুমোদনের চেষ্টা হয়েছে। বি টি তুলো চাষের তিক্ত অভিজ্ঞতা এবং বি টি বেগুনকে কেন্দ্র করে বিতর্কের ফলে জি এম ফসলের কুপ্রভাব সম্পর্কে জনগণের মধ্যে একটা ধারণা গড়ে উঠেছে। ফলে জি এম ফসলের চাষ এবং পরীক্ষামূলক চাষের বিরুদ্ধে আন্দোলন হচ্ছে, প্রতিরোধ হচ্ছে। কর্ণাটকে বি টি বেগুন চাষের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন হয়েছে এবং সেখানে সরকার বি টি বেগুন চাষ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। হরিয়ানায় বি টি ভুট্টার পরীক্ষামূলক চাষ বন্ধের অনুমতি দেয় নি (দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১২)। ওরিশা সরকারও বি টি বেগুন এবং অন্য কোনো জি এম ফসলের অনুমোদন দেবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে (infochangeindia.org)।

সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে মহারাষ্ট্রে। সেখানে রাজ্য সরকার ২০১২ সালের আগস্টে মাহিকোর বি টি তুলো বীজের ব্যবসা বন্ধ করেছে এবং তাদের লাইসেন্স বাতিল করেছে (দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া, ৯ আগস্ট, ২০১২)। ভারতের কৃষি বিষয়ক পার্লামেন্টারি কমিটি আগস্টে সরকারের কাছে বি টি বেগুন সহ সব রকম জি এম ফসলের পরীক্ষামূলক চাষ বন্ধ করার সুপারিশ করেছে (ডেকান হেরাল্ড, ৯ আগস্ট, ২০১২)। অনেক দেরি হলেও এটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। জি এম ফসল নিয়ে সব রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা বন্ধ হওয়া দরকার, সারা বিশ্ব সেদিকেই ঝুঁকছে। অথচ এ দেশের কিছু বিজ্ঞানী বি টি বেগুনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার জন্যে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন এবং সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করার কথা বলছেন (in news.yahoo.com 26 January, 2011)।

বি টি জিন যুক্ত ফসল থেকে অ্যালার্জি, হজমের গোলমাল, যকৃতের সমস্যা ইত্যাদি নানা রকম সমস্যা হচ্ছে। প্রোটিন বাড়ানোর জন্যে যে সব ফসলে চীনা বাদাম কিংবা ব্রাজিল নাটের জিন যুক্ত আছে তা থেকেও অ্যালার্জি হচ্ছে। বি টি বেগুন সহ অন্যান্য বি টি জিন যুক্ত ফসলের প্রভাব দেখার জন্যে ইঁদুর, খরগোস, ছাগল, গরু, মুরগি ইত্যাদি নিয়ে যে সব পরীক্ষা হয়েছে সে সব ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাবের প্রমাণ পাওয়া গেছে।

জি এম ফসল থেকে বিপদ

জিএম ফসলের চাষ শুরু হয়েছিল প্রধানত বহুজাতিক বীজ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে এবং স্বার্থে। আমেরিকার ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সে সবের অনুমোদন দিয়েছিল এবং ঘোষণা করেছিল জি এম ফসল থেকে কোনো ক্ষতির আশঙ্কা নেই কারণ সেগুলি খুব ভালোভাবে পরীক্ষিত। সে সময় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সহ আরো কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংস্থাও একই কথা বলেছিল। বাস্তবে তা কিন্তু হয় নি। জি এম ফসলের চাষ শুরুর কয়েক বছরের মধ্যেই পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে কিছু কিছু অবাঞ্ছিত ঘটনার খবর আসতে থাকে এবং সময়ের সঙ্গে তা বাড়তে থাকে। সে সব ঘটনাগুলির ভিত্তিতে জি এম ফসল থেকে মানুষ ও প্রাণীর স্বাস্থ্যহানি এবং পরিবেশের ক্ষতির বিষয়গুলি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। তখন থেকেই জিন প্রতিস্থাপিত ফসলের চাষ এবং তার ব্যবহার নিয়ে পৃথিবী জুড়ে বিরোধিতা শুরু হয়।

জিন প্রতিস্থাপিত ফসলে আপত্তির অন্যতম কারণ মানুষ ও প্রাণীর স্বাস্থ্যহানি। বি টি জিন যুক্ত ফসল থেকে অ্যালার্জি, হজমের গোলমাল, যকৃতের সমস্যা ইত্যাদি নানা রকম সমস্যা হচ্ছে। প্রোটিন বাড়ানোর জন্যে যে সব ফসলে চীনা বাদাম কিংবা ব্রাজিল নাটের জিন যুক্ত আছে তা থেকেও অ্যালার্জি হচ্ছে। বি টি বেগুন সহ অন্যান্য বি টি জিন যুক্ত ফসলের প্রভাব দেখার জন্যে ইঁদুর, খরগোস, ছাগল, গরু, মুরগি ইত্যাদি নিয়ে যে সব পরীক্ষা হয়েছে সে সব ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাবের প্রমাণ পাওয়া গেছে। ফ্রান্সের বিজ্ঞানী প্রফেসর গিলে-এরিক সেরালিনি বি টি বেগুন নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন এই বেগুনের মধ্যে প্রতি কেজিতে ১৬-১৭ মিলিগ্রাম বি টি বিষ রয়েছে। সেই কারণে পরীক্ষাধীন প্রাণীর রক্তের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটছে, যকৃতের ক্ষতি হচ্ছে, ডায়ারিয়া হচ্ছে, জল খাওয়ার পরিমাণ বাড়ছে এবং খাদ্য গ্রহণের স্বাভাবিকত্ব নষ্ট হচ্ছে জিন প্রযুক্তিতে মার্কার হিসেবে ব্যবহৃত অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট জিনও বি টি বেগুনে আছে, তার জন্যেও ক্ষতি হতে পারে। সেরালিনি বলেছেন, বি টি বেগুন মানুষ ও প্রাণীর স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। শুধু বিটি জিন যুক্ত ফসলই নয় অন্য জি এম ফসল থেকেও অ্যালার্জি সহ নানা রকম স্বাস্থ্য সংস্যা এখন আর কেবল আশঙ্কা নয়, বাস্তব। সচেতন মানুষ তাই জি এম ফসল চাইছে না।

জি এম ফসল নিয়ে আপত্তির দ্বিতীয় কারণ পরিবেশের ওপর

এর খারাপ প্রভাব। নিউইয়র্কের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের লিন্ডা রয়ার (১৯৯৯)-এর গবেষণায় বি টি ভুট্টার পরাগ খেয়ে মনার্ক প্রজাপতির লার্ভার মৃত্যুর ঘটনাকে বলা হয়েছিল 'ওয়ার্নিং বেল'। গভীর উদ্বেগের সঙ্গে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বি টি জিন যুক্ত ফসলের বিষে অক্ষতিকর এবং উপকারি কীটপতঙ্গ মরে যাবে, ফলে ঘাস জমির বাস্তুতন্ত্রটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে। তাঁর আশঙ্কা এখন অনেক জায়গায় বাস্তব।

জি এম ফসলে যুক্ত জিন মুক্ত পরাগযোগের ফলে সাধারণ দেশী জাতে কিংবা প্রকৃতির জংলি জাতগুলিতে সহজেই স্থানান্তরিত হতে পারে। তার ফলে জংলি জাত এবং কৃষি ক্ষেত্রের বিশুদ্ধ দেশী জাতগুলি হারিয়ে যাবে। কেউ কোনো ফসলের দেশী জাতের চাষ করতে চাইলেও পাশের জমির জি এম ফসলের পরাগযোগে তার বিশুদ্ধতা থাকবে না। এই কারণে পৃথিবীর অনেক দেশের মতো আমাদের দেশেও জি এম ফসল চাষের ক্ষেত্রে প্রতিরোধ হচ্ছে। অল ইন্ডিয়া রাইস এক্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশন উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, পাঞ্জাবসহ যে সব রাজ্যে বাসমতী ধানের চাষ হয় সেখানে জি এম ধানের পরীক্ষামূলক চাষের তীব্র বিরোধিতা করেছে এবং অনেক জায়গায় চাষীরা সেসব জমির ধান পুড়িয়ে দিয়েছে।

জি এম ফসল তৈরি করতে যে জিন প্রযুক্তি ব্যবহার হয় তার কোনো কোনোটিতে মার্কার হিসেবে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট জিন থাকে এবং সেই জিন ফসলে রয়ে যায় (যেমন - বি টি বেগুন)। সেই জিনও তো স্থানান্তরিত হতে পারে এবং হচ্ছেও। অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট জিন রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে স্থানান্তরিত হলে সেগুলিকে আর ঐ বিশেষ অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দমন করা যাবে না। এর ফল কিন্তু মারাত্মক।

টারমিনেটর জিন যুক্ত জি এম ফসল এক কথায় ভয়ঙ্কর। জীবনপ্রবাহ থামিয়ে দেয় এই জিন। এই জিন যুক্ত উদ্ভিদে ফুল, ফল, বীজ হবে কিন্তু সেই বীজ থেকে গাছ হবে না। এই জিনের পেটেন্ট (নং - US# 5723, 765, তারিখ - 03.03.1998) নিয়েছিল USDA (United States Depatment of Agriculture) এবং Delta and Pine Land Co. যৌথভাবে। ডেল্টা অ্যান্ড পাইন ল্যান্ড এখন মনসান্টোর অধীনে এই জি প্রয়োগ নিয়ে বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় বয়ে গেছে। মনসান্টো এবং USDA এই জিন কোথাও প্রয়োগের কথা বলে নি, কিন্তু ভবিষ্যতে টারমিনেটার জিন ছাড়া কোনো বীজই পাওয়া না যাবার কথা বলেছে। বিষয়টি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ এবং অত্যন্ত উদ্বেগের। F_1 হাইব্রিড বীজ উৎপাদন থেকেই বহুজাতিক বীজ ব্যবসায়ীরা ছলে বলে কৌশলে চাষীদের কাছ থেকে বীজ তৈরির অধিকার ছিনিয়ে নিতে চাইছে। টারমিনেটার জিন প্রয়োগ করেও বীজ বিক্রির ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার পেতে চাইছে বীজ ব্যবসায়ীরা। কিন্তু এই জিনও তো মুক্ত পরাগযোগের মাধ্যমে সাধারণ ফসল ও জংলি জাতের মধ্যে সঞ্চারিত হতে পারে। শুধু তাই নয় ছত্রাক, ভাইরাস বা জাবপোকার মাধ্যমে এই জিন অনাত্মীয় উদ্ভিদের মধ্যেও প্রবাহিত হতে পারে (জেফ পামার ১৯৯৮)। এর পরিণতিতে সব উদ্ভিদই বন্ধ্যা হয়ে যেতে পারে। কী সাংঘাতিক! এতো পরমাণু বোমার চেয়েও মারাত্মক। কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার ২০০৬ সালে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট নতুন কোনো জি এম ফসলের পরীক্ষামূলক চাষ নিষিদ্ধ করলেও দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের তৈরি টারমিনেটার জিন যুক্ত সরষেকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে নি। পরবর্তী সময় জনস্বার্থ রক্ষা মামলায় এই বিপজ্জনক ফসলটি নিষিদ্ধি করার জন্যে চাপ সৃষ্টি করা হয় (ISIS Report - 2007)।

জি এম ফসল থেকে পরাগের মাধ্যমে বা অন্যভাবে পোকা মারার বিষ জিন, অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জিন, আগাছা নাশক প্রতিরোধী জিন সহ আরো নানা রকম প্রতিস্থাপিত জিন অলক্ষ্যে অন্য জীবে সঞ্চারিত হয়ে হাজার হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা পরিবেশের শৃঙ্খলা নষ্ট হতে বসেছে। কয়েক বছর আগেই কানাডাতে আগাছা নাশক সহ্য করার ক্ষমতা সম্পন্ন আগাছা পাওয়া গেছে। কাজেই সাবধান।

সারা বিশ্বে কী হচ্ছে

জি এম ফসলের চাষ শুরু হয় আমেরিকায় এবং প্রচারের গুণে চাষীরা সেগুলি আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেছিল। বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও বেশ দ্রুত জি এম ফসলের অনুপ্রবেশ ঘটে। অবশ্য চাষীদের আগ্রহেই তা হয়েছে এমন নয়, অনেক ক্ষেত্রে সুকৌশলে তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেভাবেই হোক না কেন জি এম ফসলের চাষ বেড়েছে। পরিসংখ্যান থেকে দেখা গেছে পৃথিবীতে জি এম ফসলের আওতায় জমির পরিমাণ ছিল ১৯৯৬ সালে ১৭.৪ লাখ হেক্টর, ২০০০ সালে ৪৪১.৯ লাখ হেক্টর, ২০০৫-এ ৯০০ লাখ হেক্টর, ২০০৯-এ ১৩৪০ লাখ হেক্টর।

জি এম ফসল থেকে মানুষের স্বাস্থ্য ও পরিবেশের ক্ষতি হবার বিষয়গুলি জানা গেছে চাষ শুরুর দু-এক বছরের মধ্যেই এবং ক্রমশ মানুষ সচেতন হয়েছে এবং দেশে দেশে জি এম ফসল বাতিল করার জন্যে জনমত তৈরি হয়েছে। তাও জি এম ফসলের চাষ বাড়ছে!

আগে উল্লেখ করা হয়েছে জি এম ফসল মূলত বীজ ব্যবসার স্বার্থে তৈরি হয়েছে এবং বিভিন্ন দেশে জি এম ফসলের স্তিারও ঘটেছে একই কারণে। কিন্তু যতটা হয়েছে, তার চেয়ে প্রচার হয়েছে অনেক বেশি। জীবপ্রযুক্তির খবরাখবর প্রচার হয় ISAAA (International Service for the Acquisition of Agrobiotechnology Application)-এর মাধ্যমে। তাদের প্রকাশিত প্রতিবেদনে পরিসংখ্যান ও তথ্য অতিরঞ্জনের অভিযোগ উঠেছে এবং সেগুলি প্রমাণিত হয়েছে (ISIS Report -2007)।

কাজেই যতটা বলা হয়েছে তার সবটা সত্যি নয় —যেমন ইরানে ২০০৬ সালে দশ হাজার হেক্টর জি এম ধান চাষের কথা বলা হয়েছে কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হল সেখানে জি এম ধান চাষের অনুমোদনই দেওয়া হয় নি; রুমানিয়ায় এক লক্ষ হেক্টর জি এম ফসল চাষের উল্লেখ করা হয়েছে অথচ ২০০৭ সাল থেকে সেখানে জি এম সয়াবিন চাষ নিষিদ্ধ করা হয়েছে; ২০০৫ সালের রিপোর্টে দক্ষিণ আফ্রিকায় এক লক্ষ হেক্টর জমিতে জি এম বন্টন চাষের উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে হয়েছে মাত্র পাঁচ হাজার হেক্টর; ...ইত্যাদি।

ISAAA-এর সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে কিছু সংশোধন করা হয়েছে। সেই প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে ২০০৯ সালে পৃথিবীর মোট কৃষিজমির মাত্র ২.৭ শতাংশ রয়েছে জি এম ফসলের দখলে। জি এম ফসল উৎপাদনকারী ২৫টি দেশের মধ্যে জার্মানি ২০০৯ সাল থেকে এর চাষ একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে এবং আরো ছ'টি দেশে (কমার হার—চীন -৩%, স্পেন-৪%, প্যারাগুয়ে-১৯%, চেক রিপাবলিক -৩১%, স্লোভাকিয়া ৫৪% এবং রোমানিয়া -৫৭%)। ইওরোপিয়ান ইউনিয়নের দেশগুলি অনেকদিন আগে থেকেই জি এম ফসল কেনা বন্ধ করেছে।

প্রথমের দিকে আমেরিকায় কেক, পাউরুটি, প্যাস্ট্রি, বিস্কুট, সস, জ্যাম, চিপস ইত্যাদি তৈরি খাবারের (প্রসেসড ফুড) ৬০ শতাংশের মধ্যে কোনো না কোনো জি এম ফসল থাকত। কিন্তু ক্রমশ চিত্রটা বদলে গেছে। ক্রেতাদের দাবিতে জি এম ফসল যুক্ত খাবারে লেবেল লাগাতে হয়েছিল এবং অধিকাংশ ক্রেতা জি এম ফসল যুক্ত খাবার গ্রহণ করে নি। মানুষের খাবারে জি এম ফসলের ব্যবহার এখন প্রায় বন্ধ হবার মুখে। বর্তমানে পৃথিবীতে যত জি এম ফসলের উৎপাদন হয়, তার মাত্র এক ভাগ মানুষের খাবার হিসেবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ব্যবহার হচ্ছে। বাকি ৯৯ শতাংশের বেশির ভাগ ব্যবহার হচ্ছে পশুখাদ্য ও মুরগির খাবার তৈরি, অ্যালকোহল তৈরি, জৈবজ্বালানি তৈরিতে; আর কিছু অংশ জি এম তুলো। কিন্তু তাতেও তো বিপদটা কেটে যায় নি। জি এম ফসল চাষ হওয়াটাই বিপদের।

ওয়াশিংটন ডি সি-এর এগ্রিকালচার অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি অব দ্য ইউনিয়ন অব দ্য কনসার্নড সাইনটিস্ট-এর ডিরেক্টর মার্গারেট মেলন স্বাস্থ্য ও পরিবেশের ওপর জি এম ফসলের প্রভাবরে কথা বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন —'এখন আমাদের যথেষ্ট পরিমাণ খাবার আছে, কিন্তু সকলে তা পাচ্ছে না। দাম কম রাখলেও সব ক্ষুধার্ত মানুষের সে সব কেনার সামর্থ্য নেই। জিন প্রযুক্তি কি এই অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করতে পারবে।' তিনি আরো বলেছেন —'এটা ভাবতেও অবাক লাগছে যে, সংকরায়ণ পদ্ধতি যা আমাদের এগ্রিকালচারাল পাওয়ার হাউস হতে সাহায্য করেছে, এত তাড়াতাড়ি তাকে অনেকেই ভুলতে বসেছে।' রাষ্ট্রসংঘের ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন (FAO)-এর Global Persrective Studies-এর ২০০০ সালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে —'সামগ্রিকভাবে পৃথিবীতে খাদ্য উৎপাদনের যা সম্ভাবনা আছে তা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি এবং ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের পক্ষে যথেষ্ট। ...পৃথিবীর মানুষের খাবার জোগানোর জন্যে জি এম ফসলের প্রয়োজন নেই।' তাই এ প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই আসে —তাহলে জি এম ফসলের চাষ করে বিপদ ডেকে আনব কেন?

গত ১৮ বছর ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সমীক্ষা ইত্যাদি করে দেখা গেছে জি এম ফসলে ফলন বাড়ে নি, পুষ্টিগুণ বাড়ে নি এবং অন্য কোনো প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য যুক্ত হয় নি। উপরন্তু জি এম ফসল মানুষ ও জীবজন্তুর স্বাস্থ্যে ক্ষতি করছে, চাষীদের বীজ রাখার স্বাধীনতা খর্ব হচ্ছে, চাষীদের আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে এবং পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে। সারা বিশ্ব এখন জৈব কৃষি প্রযুক্তির দিকে ঝুঁকছে; দাবি উঠছে জি এম ফসল মুক্ত পৃথিবীর এবং ক্রমশ তা জোরদার হচ্ছে।

তথ্যসূত্র:

১। Does the World Needs G.M. Food? -Yes: Robert B. Horsch; Sc. Americana - 18.4.2001

২। Does the World Needs G.M. Food? -No: Mergaret Mellon; Sc. Americana, 18.4.2001

৩। Golden Rice - Wikipedia, the free encyclopedia.htm

৪। Campaign to Ban Genetically Engineered Food- www.netlink.de

৫। Global GM Crops Area Exaggerated -ISIS Report-29.1.07, www.i-sis.org.UK

৬। New briefing on ISAAA and its global status Report.www.gmwatch.org

৭। GM Crops Expansion Limited in 2009 - Reduction in EU. www.aseed.net

৮। FAO report reveals GM Crops not needed to feed the world. www.btinternet.com

৯। India Says no to Bt. brinjal for now. www.business.rediff.com

১০। Bt. Brinjal Unfit for Human Consumption. www.i-sis.org.uk

১১। What is Bt. Brinjal and why the cotroversy? www.my bangalore.com

১২। কৃষি উদ্ভিদের উন্নয়ন, ফসল ও তার বিপদ - সুনীতিকুমার মণ্ডল, শারদীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞান, ২০০৩

১৩। শুধু বি টি বেগুন বাতিলই নয়, চাই জি এম ফসল মুক্ত পৃথিবী, শারদীয় বাংলার আভাষ, ২০১০।

উমা

এক ঘুমভাঙানিয়া বই

দীপক ভট্টাচার্য

খুব বেশিদিন আগের কথা নয়, খোদ কলকাতার বুকেও এমন জায়গা ছিল যেখানে ভোরবেলা ঘুম ভাঙত অসংখ্য পাখির কলকাকলিতে। দক্ষিণ কলকাতার ঢাকুরিয়া লেকের কথা তো বিশেষ করেই বলা যায়।

কত রকমের পাখি ছিল এখানে ময়না, দোয়েল, ফিঙে, টিয়া, মাছরাঙ্গা, কাঠঠোকরা, বসন্তবৌরি, কোকিল, বেনে-বৌ, ঘুঘু, চিল, পানকৌড়ি, হাঁস, রাজহাঁস, পায়রা, ছোট চড়াই, বড় চড়াই ইত্যাদি। আর কাক তো আছেই। রাত্রে প্যাঁচা। ক্রমশ কমছে পাখি। হয়ত এমন দিন আসছে, যখন কোনো পাখির ডাক শোনা যাবে না। সব শান্ত। কর্কশ আওয়াজ থেকে মধুর শিষ—সব শেষ।

এক জায়গায় পড়েছিলাম, প্রয়াত সংগীতশিল্পী রামকুমার চট্টোপাধ্যায় বলছেন —'আমাদের ছেলেবেলায় কত গাছ ছেলো'। তা গাছ থাকা মানেই তো ছায়া, হাওয়া, পাখির ডাক —জীবনচক্র সম্পর্কিত আরো কত ছোট/বড় প্রাণী —কীট পতঙ্গ। কলকাতা আকারে ও প্রকারে বড় হচ্ছে তার জন্য প্রয়োজনে (এবং অপ্রয়োজনে) গাছ কাটা হচ্ছে। পাখির ডাক শোনার সুযোগ কলকাতাবাসীর কমছে। কিন্তু শুধু কি কলকাতা শহর? অন্যত্র নয়? তবে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, গাছ থাকলেও পাখি থাকছে না —এমন অবস্থা আসতে পারে? উত্তর —আসতে পারে। হয়তো ঢাকুরিয়া লেক অঞ্চলে নয়, কিন্তু অন্যত্র?

সম্প্রতি একটা অসাধারণ বই প্রকাশের পঞ্চাশ বছর পূর্তি হয়ে গেল। বইটির নাম SILENT SPRING। লেখিকা রাচেল কার্শন। বইটির প্রথম প্রকাশ ১৯৬২ সালে। মূলত এই বইয়ের কারণেই মার্কিন সরকার পরিবেশ সংরক্ষণ সংস্থা (ই পি এ, পুরো কথা এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন এজেন্সি) প্রতিষ্ঠা করে।

এই বইটা আগে আমার চোখে পড়ে নি। গত সেপ্টেম্বর সংখ্যার ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক পত্রিকায় একটা ছবির দিকে আমার দৃষ্টি গেল। আশা করি পাঠক পাঠিকারা আমার ছোট ক্যামেরায় তোলা ছবিটা দেখে ছবির সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারবেন বিষয়বস্তু সহজেই অনুমেয়। ছবিটার নিচে কেন টেকো ঈগলের (বড় ঈগল) বাসায় একটা মাত্র ডিম তার সম্ভাব্য কারণ দেওয়া হয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে 'সাইলেন্ট স্প্রিং' বইটার নাম। ঘটনাচক্রে হাতে পেয়েও গেলাম বইটা। ৩০০ পাতার মতো বইটা পড়ে একদিকে যেমন হতাশায় মনটা ভরে গেল, পাশাপাশি লেখিকার আশাবাদী মনোভাব আমার মধ্যেও যে সঞ্চারিত হয় নি, এমনটি বলতে পারছি না। হতাশার কারণ—মানুষের উত্তরোত্তর চাহিদা মেটানোর জন্য প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ যার পরিণতি মানুষের পক্ষে যাচ্ছে বা যাবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। সাময়িক সফলতা পেলেও ভবিষ্যতের প্রজন্মের বিরুদ্ধে যে প্রকৃতি প্রতিশোধ নেবে না কেউ বলতে পারে না। আশাবাদী হওয়ার কারণ প্রকৃতির সঙ্গে বোঝাপড়া করে, মানানসই এবং সহনীয় হবে এমন প্রক্রিয়া বার করা সম্ভব। তার জন্য মানুষের বর্তমান দর্শন ও জীবনবোধ পাল্টাতে হবে। মানুষ যে প্রকৃতির থেকে শক্তিশালী হতে পারে, কিছু মানুষের এই ধারণা অবিলম্বে শেষ হওয়া দরকার। সেজন্য প্রয়োজন সর্বস্তরে জনসচেতনতা বাড়ানো।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দুই এক দশক থেকে শুরু করে পুরো বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের নানান শাখায় অভাবনীয় ও অস্বাভাবিক গতিতে উন্নতি হয়েছে, তার সঙ্গে সঙ্গে হয়েছে শিল্পের অবাধ প্রসারণ। নানাবিধ রোগের প্রতিষেধক ও নিরাময়ক ওষুধের আবিষ্কার ও সমাজে স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে বেড়েছে প্রবল জনসংখ্যা। ফলস্বরূপ চাহিদা বেড়েছে খাদ্যদ্রব্যের ও জীবনযাত্রার মানের। এইসবের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আশ্চর্য হই না যখন দেখি বিশেষ করে আমেরিকায় বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকে ব্যাপকহারে ব্যবহার শুরু হল (তথাকথিত বা সত্যিকারের) পরগাছা/আগাছা ও কীট পতঙ্গ বিনাশকারী অজৈব

রাসায়নিক পদার্থের—যেমন ডিডিটি, ডিডিডি, ক্লোরডেন, হেপ্টাক্লোর, ডিয়েলড্রিন, এন্ড্রিন, প্যারাথিয়ন, ম্যালাথিয়ন ইত্যাদির ব্যবহার। এ যেন মশা মারতে কামান দাগা। শব্দহীন বসন্ত বইতে লেখিকা অজস্র উদাহরণ দিয়ে অধ্যায়ে অধ্যায়ে দেখিয়েছেন, কী ভাবে অনিয়ন্ত্রিত এবং ফলাফল পূর্ববিচার না করে এই সব রাসায়নিক যৌগের ব্যবহার সব প্রাণীর জীবনচক্রকে কী ভাবে ক্ষতি করে। হয়তো মারতে চাওয়া হল এক ধরনের শস্য ধ্বংসকারী কীটকে। কীট হয়ত মরল (বা হয়ত সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হল না), কিন্তু তার সঙ্গে মরল অন্যান্য প্রাণীরাও। বাতাস বাহিত হয়ে রাসায়নিক পদার্থের সংক্রমণ ঘটল ঘাসে, জলে, গাছের পাতায়। বিষযুক্ত পাতার ঘাস খেয়ে বিষ ঢুকল গরু ছাগলের দেহে। দুধ আর মাংসের মাধ্যমে বিষ ঢুকল মানুষের দেহে। নদীতে মাছ হয় বিষযুক্ত হলো বা মরল, বিষযুক্ত শ্যাওলা বা ছোট কীট খেয়ে যারা ইতিমধ্যে বিষাক্ত হয়ে গেছে, যে সব মাছ মরল না, সে সব মাছ খেয়ে মানুষ বিষ নিজের শরীরে নিয়ে নিল। বিষযুক্ত কীট খেয়ে পাখিরা অসুস্থ হলো, হয় মরল বা বন্ধ্যা হয়ে গেল। ডিম পাড়ার কথা চার-পাঁচটা পাড়ল হয়ত একটা। সেই ডিমটা হল নির্বীজ বা তা না হলেও ডিমের খোলা এমন পাতলা হল যে ডিম ফুটে বাচ্চা হওয়ার আগেই ভেঙ্গে গেল। ফলত পাখির সংখ্যা কমল।

এই সব বিষ শরীরে নিলে মানুষের কী হবে? তাৎক্ষণিক কিছু নাও হতে পারে, যদি না অনেক পরিমাণ শরীরে ঢোকে। কিন্তু সুদীরপ্রসারী কুফল হতে বাধ্য। এই প্রসঙ্গে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ আর এই সব বিষের বিশেষ কোনো তফাত নেই—বিশেষ করে কর্কট রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। আর অন্যান্য অসুখের ব্যাপারে রাসায়নিক বিষ নিজস্ব ক্ষমতা নিয়ে কাজ করবে। যেমন যকৃতের বিনাশ বা ক্ষয়। আর যকৃত খারাপ থাকলে যে সব রোগ হয়, সব জাঁকিয়ে বসবে, যা তিল তিল করে মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবে। আমি এবার পূর্বোক্ত বইটার অধ্যায়গুলোর নাম বলছি। যদি পাঠক পাঠিকারা এ পর্যন্ত কিছু পরিমাণ হলেও আগ্রহ পেয়ে থাকেন তবে শিরোনাম পড়লে বইটা সম্বন্ধে একটু বেশি উৎসাহিত হবেন।

অধ্যায় এক : আগামী দিনের উপকথা
(A Fable for Tomorrow)
দুই : সহ্য করার বাধ্যবাধকতা
(The Obligation To Endure)
তিন : মৃত্যুর অমৃত (Elixir of Death)
চার : উপরতলের জল ও ভূগর্ভের সমুদ্র
(Surf Waters And Underground Seas)
পাঁচ : মাটির জগৎ (Realms Of The Soil)
ছয় : পৃথিবীর সবুজ আচ্ছাদন
(Earth's Green Mantle)
সাত : অহেতুক বিধ্বংস (Needless Havoc)
আট : পাখি আর গান গাহে না
(And No Birds Sing)
নয় : মৃত্যুর নদী (Rivers Of Death)
দশ : আকাশ থেকে বাছবিচারহীন (প্রক্রিয়া)
(Indiscriminately From The Skies)
এগারো : বর্গিয়ার স্বপ্নের ও পারে
(Beyond The Dreams Of The Borgias)
বারো : মানুষের ওপর ধার্য মূল্য (The Human Price)
তেরো : সংকীর্ণ জানলার মধ্য দিয়ে
(Through A Narrow Eindow)
চোদ্দ : প্রত্যেক চারজনের মধ্যে একজন
(One In Every Four)
পনেরো : প্রকৃতির প্রতিশোধ (Nature Fights Back)
ষোল : তুষারধসের গুড়গুড় শব্দ
(The Rumblings Of An Avalanche)
সতেরো : অন্য পথ (The Other Road)

রাচেল কার্শনের জীবনী সম্প্রতি বেরিয়েছে। নাম On A Farther Shore। লেখক উইলিয়াম সাউডার। ১৯৬২ সালের 'সায়লেন্ট স্প্রিং' বইটার প্রকাশের আগে লেখিকা আর একটা বেস্ট সেলার প্রকাশ করেছিলেন, নাম 'দ্য সি অ্যারাউন্ড আস'। এই তিনটি বই-ই বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। বাজার বলতে ইন্টারনেটে।

সায়লেন্ট স্প্রিং-এ বেশির ভাগ উদাহরণ আমেরিকার। কিছু আছে ইউরোপের, আর দুই একটা অস্ট্রেলিয়ার। তার মানে কি এই আমেরিকাতেই দূষণ প্রক্রিয়া সবচেয়ে বেশি এবং এই দূষণ প্রক্রিয়া চালু রাখা বা নিয়ন্ত্রণ না করার মানসিকতা সবচেয়ে প্রবল? আমার মতে তাই। প্রথম কথা ইউরোপীয়দের মতো আমেরিকার শ্বেতকায় জাতির কোনো প্রাচীন ইতিহাস নেই, ঐতিহ্য নেই। রেড ইন্ডিয়ানদের প্রায় নির্মূল করে জনবসতি গড়ে তোলার পেছনে যে মানসিকতা, সেই একই ধরনের মানসিকতা কাজ করে, পারিপার্শ্বিক জীবজগত সম্পর্কে উদাসীনতা তৈরি করতে এমন কি এদের শত্রুরূপে বিচার করতে। বর্তমানে কার্বন-অর্থনীতির ব্যাপারে ইউরোপীয় দেশগুলির সঙ্গে আমেরিকার নীতিগত বা মানসিকতার তফাৎ এই পার্থক্যেরই পরিচয় বহন করে। এই প্রসঙ্গে ইংল্যান্ডের একটা সাম্প্রতিক উদাহরণ পাঠক পাঠিকাদের আগ্রহান্বিত করতে পারে।

আমরা জানি গাছের কাঠ থেকে কার্বন রূপান্তরের চারটি ক্রম পর্যায় আছে। প্রথমে পিট তারপর লিগনাইট, তারপর বিটুমেন ও সর্বশেষে অ্যানত্রাসাইট। পিট কিছু কিছু দেশে পাওয়া যায় জলাভূমি অঞ্চলে। এরকম কিছু অঞ্চল ইংল্যান্ডে আছে। পিট বহুকাল ধরে ইংল্যান্ডে ব্যবহার হয়ে আসছে বিভিন্ন ধরনের বাগানের আর বাগিচার সার হিসাবে। কিন্তু এই পিটের ব্যবহার আইন করে আস্তে আস্তে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, কারণ, এই পিট নেওয়া হয়

পঙ্কিল জলাভূমির উপরের স্তর থেকে —যার ফলে এই যে জলাভূমি যাদের কার্বন ডাই অক্সাইড ধরে রাখার ক্ষমতা পৃথিবীর বিভিন্ন গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অরণ্যের (Rain Forest) থেকেও বেশি, যা আস্তে আস্তে বিলীন হয়ে যাবে। এই পিটের ব্যবহার আমেরিকায় চলছে এবং চলতেই থাকবে। বিশ্ব উষ্ণায়ণের ব্যাপারে ইউরোপীয় দেশগুলির সঙ্গে আমেরিকার পার্থক্যের কথা আমরা খানিকটা জানি। কাজেই আমেরিকায় যে পিটের ব্যবহার চলবে, তা বিস্ময়ের উদ্রেক করে না।

উপরে এত সব 'কথা বলার' চেষ্টা করলাম, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশের অবস্থাটা কি? ড্যানিয়েল প্যাট্রিক মইনিহান এক সময়ে ভারতে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত ছিলেন। তিনি একবার বলেছিলেন ভারতকে উন্নয়নশীল দেশ বলা যায় না। কিছু অংশে ভারত উন্নত, অন্য অংশে অনুন্নত। সত্যিই তাই। এই অবস্থা বিদ্যমান অনেক কাল আগে থেকে। ফুল্লরা কালকেতুর ('আমানির গর্ত দেখ বিদ্যমান') সময় কি রাজা-রাজড়া শ্রেষ্ঠী এরা ছিল না? মোগল সাম্রাজ্যের সময় কি ধনপ্রতিপত্তি দেশের সামান্য কিছু অংশেই সীমাবদ্ধ ছিল না? বর্তমানে এই অবস্থা আরও প্রকট। তা হলে পরিবেশ দূষণের ব্যাপারে দেশের নগরভিত্তিক অঞ্চল ছাড়া অন্য অঞ্চলগুলোর জন্য আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়ব কেন? এ কথা সত্যি বলে ধরা যেতেই পারে কাঠ, কয়লা ইত্যাদি পোড়ানোর ব্যাপারে। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে, চীন, জাপানে যে পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্নজনিত অবস্থা আছে, সেই অবস্থায় ভারত কোনো দিন পৌঁছবে কিনা সন্দেহ! কিন্তু অন্যান্য ব্যাপারে একথা বলা যায় না। যে হারে জনসংখ্যা বাড়ছে সে কারণে খাদ্য শস্য ফলমূল আরো বেশি বেশি উৎপন্ন করার জন্য যে চাপ, সেক্ষেত্রে কোনো না কোনো ভাবে রাসায়নিক পদার্থজনিত দূষণ বাড়তে বাধ্য। সর্বোপরি হচ্ছে জল। জলে আর্সেনিক, কীটনাশক ও পরগাছানাশক পদার্থের জন্য যে সমস্যা তৈরি হচ্ছে তা ভবিষ্যতে ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি করতে বাধ্য। আমরা কি তার জন্য চিন্তিত? কিছু করছি কি তার জন্য? কিছু করলেও প্রয়োজনীয় পরিমাণে? ব্যক্তিগত স্তরে? পারিবারিক স্তরে? সামাজিক স্তরে, ইন্ডাস্ট্রি স্তরে ও সর্বোপরি রাজনৈতিক স্তরে? আমার মতে সর্বস্তরেই উদ্যোগের অভাব রয়েছে। তবে পাঠক-পাঠিকাদের অন্য মত থাকতে পারে।

শেষ করছি আমার এক ব্যক্তিগত মত দিয়ে আর ইংরেজ কবি কিটসের কবিতার এক উদ্ধৃতি দিয়ে। ব্যক্তিগত মত হচ্ছে—দূষণজনিত সব সমস্যার সার্থক সমাধান করা তখনই সম্ভব হবে, যখন দেশে জন্ম নিয়ন্ত্রণ আক্ষরিক অর্থে প্রবর্তন করা সম্ভব হবে। আর কবিতার উদ্ধৃতিটা দিচ্ছি 'শব্দহীন বসন্ত' বইতে যা দেওয়া হয়েছে তাই। The Sedge is Wither'd from the lake. And no birds Sing. (উদ্ধৃতিটা আদতে কিটসের এক বিখ্যাত কবিতা 'La Belle Dame Sans Merci'-র থেকে নেওয়া।)

পুনশ্চ: 'সায়লেন্ট স্প্রিং' বইটার ১৯৬২ সালে প্রকাশের দু'বছরের মধ্যে রাচেল কার্শন স্তন-ক্যান্সারে মারা যান। তার মধ্যে তিনি মার্কিন সরকার প্রতিষ্ঠিত পরিবেশ সংক্রান্ত কমিটির মিটিং-এ যোগ দিয়েছেন অনেক কষ্ট করে। তাঁর কোমরের হাড় তখন ভঙ্গুর হয়ে গিয়েছিল।

পুনশ্চ ২: প্রায় 'জীর্ণ' হয়ে যাওয়া ১৯৬২-র সংস্করণের 'সায়লেন্ট স্প্রিং' বইটি আমি পেয়েছিলাম নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে। আমার কাছে ব্যাপারটা তাৎপর্যপূর্ণ। ঐ মিশনের ক্যাম্পাসে যাঁরা গিয়েছেন, তাঁরা দেখেছেন কতরকমের গাছগাছালি ঐ ক্যাম্পাসের ভিতরে। শহরবাসী হয়ে অনেক গাছের নাম জেনেছি সেখানে গিয়েই। আগে যেগুলোকে চিনতামই না।

পুনশ্চ ৩: ভালোবাসার পাখি ও রাচেল

প্রকৃতিকে সামগ্রিকভাবেই ভালোবাসতেন রাচেল কারসন। কিন্তু 'বসন্তের দূত' পাখির প্রতি তাঁর যেন একটা আলাদা টান ছিল সবসময়। আসলে তিনি নিজেও যে এক 'মানবী পাখি'। জীবনের গানই তো সারা জীবন ধরে তিনি শুনিয়ে গেলেন আমাদের। তাঁর কণ্ঠে গান ছিল কিনা জানি না। কিন্তু অবশ্যই জানি, গান ছিল তাঁর কলমে। তাঁর কলমের গানই তো কাব্যিক ও গীতধর্মী গদ্যে ঝরে পড়েছে। এই গানে গলা মেলানোর ডাক দিয়েছেন তিনি সবাইকে। 'দ্য সী অ্যারাউন্ড আস' বইটা ছিল তাঁর আর্থিক সচ্ছলতার মাইলস্টোন। ফলে তিনি দুটো ব্যাপারে একটু অমিতব্যয়ী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর আশৈশবের শখ মেটাতে তিনি কিনলেন খুবই দামি ও সুন্দর একটি বাইনোকুলার মাইক্রোস্কোপ। তাঁর দ্বিতীয় বিলাসিতার ধন, মেইন কোস্ট-এ একটি সামার কটেজ। এর বাইরে কোনো বিলাসিতা করেন নি তিনি। রাচেলের এজেন্ট বলেছেন, তাঁর কাজই তাঁর 'হবি'। কিন্তু তিনি বিশেষভাবে ভালোবেসেছিলেন তাঁর মেরিল্যান্ডের সিলভার স্প্রিং-এর ফুলের বাগানটিকে। এই বাগানে বহু পরিযায়ী পাখি আসত। বাগানে বসে ওদের দেখতে দেখতে তিনি তন্ময় হয়ে যেতেন। পাখিদের মধ্যে দুটো পাখি তাঁকে সবচেয়ে বেশি আনন্দ দিত। একটি থ্রাশ পাখির গোত্রের পাখি ভেরি। এটি শঙ্খচিল জাতীয় পাখির কালো ঝুঁটি আর ফিঙে জাতীয় পাখির দ্বিধাবিভক্ত ল্যাজযুক্ত একটি ছোট্ট পাখি। একদা তিনি এক সাক্ষাৎগ্রহণকারীকে বলেন যে, তিনি ভেরি পাখির মরমিয়া ডাকে বিমোহিত হয়ে পড়েন। রাচেল ছিলেন চেহারায় বেঁটেখাটো অথচ গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বে অসাধারণ। সামনে তাকাতেন সরাসরি। এমন তাকানোর অভ্যাস তাঁর শৈশব থেকেই। তাকানো থেকেই বোঝা যেত তিনি বলার থেকে শুনতে বেশি আগ্রহী। ছিলেন বিনম্র স্বভাবের এবং বন্ধুত্বপূর্ণ। কিন্তু বাক্‌সংযমী। হাসতেন পরিমিত। তাঁর গুণগ্রাহীদের সঙ্গেও উদ্দীপনাময় আলোচনা এড়াতে চাইতেন। মানুষ আজও মনে রেখেছেন তাঁর লাজুক এবং গাম্ভীর্যের কথা। আজও স্মরণ করেন তাঁকে তাঁর লেখালেখি এবং পাণ্ডিত্যের গভীরতার জন্য। **উমা**

আবহাওয়া চেনার সহজপাঠ

হঠাৎ বদলায় আবহাওয়া। মাঝ-শীতে হঠাৎ কমে যায় ঠাণ্ডা, কখনও ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। আবহাওয়াবিদরা ডিপ্রেশন, ঘূর্ণাবর্ত ইত্যাদি নানান আপাত-অবোধ্য শব্দ দিয়ে যার ব্যাখ্যা করেন। একটু চেষ্টা করলে নিজেই বোঝা যাবে প্রকৃতির খামখেয়ালের কার্যকারণ। কীভাবে তা-ই বাতলাচ্ছেন অভিজ্ঞ আবহাওয়াবিদ **বিবেক সেন**।

মনে করুন ট্রেনে করে কোথাও যাচ্ছেন। ভাবলেন পাশের সহযাত্রীর সঙ্গে একটু আলাপ জমান যাক। কী বলে কথা শুরু করা যায়! কোন্ বিষয় ভদ্রলোকের পছন্দ, কোন্‌টাই বা অপছন্দের কিছুই জানা নেই। শুনেছি এমন পরিস্থিতিতে ইংরেজ সাহেবরা আবহাওয়ার প্রসঙ্গ দিয়ে কথা শুরু করে থাকেন। কারণ বোধ হয় এই যে আবহাওয়া সকলেরই আলোচনার একটি সাধারণ বিষয়। আপনি হয়ত গুমোট গরমের অভিযোগ তুললেন। ভদ্রলোক সহমত হয়ে মন্তব্য করলেন আবহাওয়াটা কেমন যেন পাল্টে যাচ্ছে। ব্যাস, শুরু হয়ে গেল বাক্যালাপ।

প্রতিদিনই আমাদের নানা রকমের আবহাওয়ার সম্মুখীন হতে হয় —কখনও আরামদায়ক, কখনও বা পীড়াদায়ক। তাই আবহাওয়া নিয়ে প্রতিনিয়তই আমরা নানা মন্তব্য করে থাকি। সেই জন্য আবহাওয়ার প্রসঙ্গ দুই অপরিচিত ব্যক্তির মধ্যেও একটা সেতু বন্ধন করে দেয়।

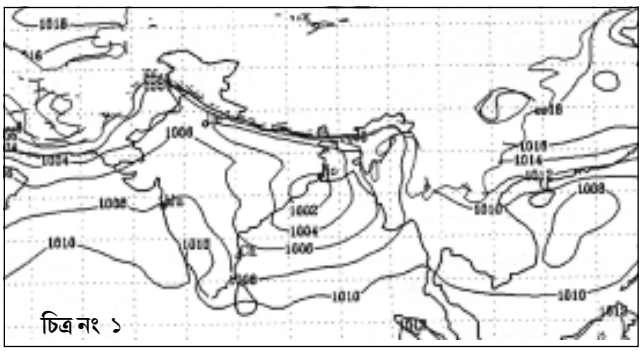

চিত্র নং ১

কিন্তু আলোচনাটা সীমাবদ্ধ থাকে কতটা গরম বা ঠাণ্ডা পড়েছে, বিশেষ করে এ বছরটা খরা চলছে বা অত্যধিক বৃষ্টির ফলে দেশটা বন্যায় ভেসে যাচ্ছে —এই পর্যন্ত। বায়ুমণ্ডলের কী পরিস্থিতিতে আবহাওয়া এরকম নানা বিচিত্র রূপ নেয় সেটা নিয়ে ভাবি না, ভাবার কথাও নয় —সেই দায়িত্ব আবহাওয়াবিদের উপর। তবে মাঝে মাঝেই তো আসন্ন আবহাওয়ার আগাম দিতে আবহাওয়াবিদ কিন্তু বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ব্যবহার করেন। যেমন 'নিম্নচাপ', 'নিম্নচাপ অক্ষরেখা' বা 'ঘূর্ণাবর্ত' ইত্যাদি। সাধারণ মানুষ অবশ্য তার মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝেন না। যদিও আবহাওয়া বিজ্ঞানের জটিলতার মধ্যে না গিয়েও এই শব্দগুলি ঠিক কী বোঝায় ও তার সঙ্গে আসন্ন অবহাওয়ার কী সম্পর্ক সেটার একটা ধারণা থাকলে পূর্বাভাসের তাৎপর্য আরও স্পষ্ট হতে পারে। হয়ত প্রকৃতির আপাত খেয়ালি চরিত্রের মধ্যে একটা নিয়মের আভাসও ধরা পড়তে পারে।

নিম্নচাপ ও তার প্রকারভেদ

সমস্ত পদার্থেরই ওজন আছে। তাই একটা পদার্থ নীচের দিকে একটা বল (ফোর্স) প্রয়োগ করে থাকে। বায়ুরও ওজন আছে। আবহাওয়া বিজ্ঞানে একক আয়তন বিশিষ্ট একটি তলের উপর বায়ুমণ্ডল যে বল প্রয়োগ করে তাকে বায়ুমণ্ডলের চাপ (অ্যাটমস্ফেরিক প্রেশার) বলা হয়। অর্থাৎ সেই তলটির উপর বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত বায়ুর একটি স্তম্ভের ওজনকে তলটির মধ্যবিন্দুর উপর বায়ুর চাপ বলে ধরা হয়। এই চাপ দেশের সর্বত্র স্বভাবতই সমান হয় না। কারণ বায়ুর ঘনত্ব সর্বত্র এক রকম নয়। শীতল বায়ু উষ্ণ বায়ুর চেয়ে ভারী। তেমনি শুষ্ক বায়ু জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ুর চেয়ে ভারী। আবার উচ্চতার উপরও চাপের মান নির্ভর করে। কারণ উচ্চতা অনুযায়ী তলটির উপর বায়ু-স্তম্ভের উচ্চতাও কম-বেশি হয়ে থাকে। তাই দেশের সর্বত্র বায়ুমণ্ডলের চাপের তুলনা করার জন্য নির্বাচিত তলের উপর বায়ুমণ্ডলের চাপের সঙ্গে তলটির নীচে সমুদ্রপৃষ্ঠ পর্যন্ত একটি বায়ুস্তম্ভ থাকলে যে ওজন হত সেটা যোগ করা হয়। এই যোগফলকে সমুদ্রপৃষ্ঠের উপর বায়ুমণ্ডলের চাপ (মিন সি লেভেল প্রেসার) বলা হয়। আমরা এর পর থেকে একেই সেই অঞ্চলের 'বায়ু-চাপ' বলে উল্লেখ করব। এখানে বলে রাখা ভাল যে সমুদ্রপৃষ্ঠের গড় উচ্চতা বলতে সমুদ্রপৃষ্ঠের উপর একটা কাল্পনিক তলকে বোঝায়। কেমন সেই কল্পনা?

পৃথিবীর আকার তো একটা গোলকের মতো। এই গোলাকার পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা সর্বত্র সমান নয়। আবার একই জায়গাতেও এই উচ্চতার হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। তাই এই পরিবর্তনশীল উচ্চতার গড় মানকে সমুদ্রপৃষ্ঠের গড় উচ্চতা বলে ধরা হয়। দেশের একটি মানচিত্রের উপর আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রগুলির পাশে পাশে বায়ু-চাপগুলি বসালে প্রথম দৃষ্টিতে তাদের মধ্যে কোনো শৃঙ্খলা দেখা যায় না। আবহাওয়াবিদ সমান

চাপ বিশিষ্ট কেন্দ্রগুলি একটা বক্র রেখা দিয়ে যুক্ত করে থাকেন। এই রেখাকে আইসোবার বা সমচাপ রেখা বলা হয়। প্রয়োজনীয় সংখ্যক সমচাপ রেখা আঁকার পর দেখা যাবে সমগ্র দেশটি কয়েকটি নিম্নচাপ ও উচ্চচাপ অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। (চিত্র নং ১)।

চিত্রটিতে সমচাপ রেখার পাশে লেখা সংখ্যাগুলি বায়ু-চাপের মান বোঝাচ্ছে। বায়ু-চাপের এককের নাম 'হেক্টোপ্যাসক্যাল' (এইচ পি এ)। ১০০২ মানের সমচাপ রেখাটি উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে একটি অঞ্চলকে বেষ্টন করে রেখেছে। এই সমচাপ রেখাটির ভিতরের যে কোনো স্থানের চাপ ১০০২-এর কম ও বাইরের যে কোনো স্থানে তার চাইতে বেশি। সেইজন্য এই অঞ্চলটিকে নিম্নচাপ বলা হয়। রাজস্থানের পশ্চিমে বায়ু-চাপ আবার কমতে শুরু করে পাকিস্তান-আফগানিস্থানের উপর আর একটি নিম্নচাপ অঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে। পূর্ব দিকে প্রশান্ত মহাসাগরের উপরেও আর একটি নিম্নচাপ অঞ্চল দেখা যাচ্ছে। ভারতের দক্ষিণে ভারত মহাসাগরের উপর এবং উত্তর-পূর্ব দিকে চীনের উপর দুটি উচ্চচাপ অঞ্চল সৃষ্টি হয়েছে। উচ্চচাপ অঞ্চলে বায়ু-চাপের বিন্যাস নিম্নচাপের ঠিক বিপরীত —অর্থাৎ বেষ্টনকারী সমচাপ রেখার ভিতরে চাপ বেশি, বাইরে কম।

দিল্লি থেকে প্রসারিত ১০০৪ মানের সমচাপ রেখাটিকে লক্ষ্য করুন। এটি বঙ্গোপসাগের উড়িষ্যা-অন্ধ্র উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত। ১০০২ মানের নিম্নচাপটি ঠিক এর মাথায় বসান। এই দুটো রেখা মিলিয়ে একটা চা-চামচের কল্পনা করুন যার হাতলটা দিল্লির কাছে আর চামচের বাটিটা রয়েছে উড়িষ্যা-অন্ধ্র উপকূলে বঙ্গোপসাগরে। তারপর মনে করুন হাতলটির মাঝ বরাবর একটা রেখা দিল্লি থেকে শুরু করে নিম্নচাপটির কেন্দ্র হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে ঘুরে আবার ১০০৪ মানের সমচাপ রেখা পর্যন্ত পৌঁছেছে। কল্পনার এই রেখাটিকে **নিম্নচাপ অক্ষরেখা** বলা হয়। এই রেখাটির উপর বায়ুচাপ তার দুই পাশের উপর বায়ু-চাপের চেয়ে কম। ১০০৪ মানের সমচাপ রেখার মধ্যবর্তী ও নিম্নচাপ রেখার দুই পাশের অঞ্চলটিকে নিম্নচাপ অঞ্চলের দ্রোণী (trough of a low) বলা হয়। সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় দ্রোণী বলতে নৌকা-আকৃতির কোনো পাত্রকে বোঝায়। নিম্নচাপ অঞ্চলের দ্রোণী নামকরণের তাৎপর্য হল, এই অঞ্চলের মাঝ বরাবর অর্থাৎ নিম্নচাপ অক্ষরেখা বরাবর বায়ু-চাপ সবচেয়ে কম এবং তার দু-পাশেই সেটা ক্রমাগত বেড়ে গেছে। (নৌকার আকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে নিন।)

বায়ুপ্রবাহ নিম্নচাপের চারদিকে সমচাপটির সঙ্গে সামান্য কোণ করে ক্রমে নিম্নচাপটির কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হয়। (২নং চিত্রে ঘূর্ণাবর্তের চারদিকে বায়ুর গতিমুখ লক্ষ্য করুন।) এই জন্য অনুভূমিক দিকে অগ্রসর হতে বাধা পেয়ে বায়ু ঊর্ধ্বমুখী হয় এবং জন্ম দেয় মেঘ ও ঝড়-বৃষ্টির। বিপরীতে উচ্চচাপ থেকে বায়ু বাইরের দিকে প্রবাহিত হয়ে অঞ্চলটিকে বায়ুশূন্য করতে থাকে। ফলে উপরের স্তরের বায়ু নিম্নমুখী হয়ে শূন্য স্থান দখল করে। আকাশ হয় মেঘমুক্ত।

নিম্নচাপ অঞ্চল সমুদ্রের উপর সৃষ্টি হয়ে থাকলে বায়ুমণ্ডলের অনুকূল পরিস্থিতিতে সেটা ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে। পৃথিবীতে যত শক্তির প্রকাশ দেখা যায় তাদের মূল উৎস সূর্য। এই সৌরশক্তির অধিকাংশই শোষিত হয় সমুদ্রগুলির জলে। বাষ্পীভবনের ফলে সমুদ্র থেকে বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্প সঞ্চিত হয়। আবার জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে তরল জলে পরিণত হওয়ার সময় বাষ্প থেকে বেরিয়ে আসা শক্তি বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে। জলীয় বাষ্পপূর্ণ উত্তপ্ত বায়ুর ঘনত্ব কম হওয়ার দরুন নিম্নচাপ অঞ্চলে বায়ুচাপ কমতে থাকে। এইজন্য নিম্নচাপ বেশি সময় সমুদ্রের উপর থাকবে, নিম্নচাপটির শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা ততই বেশি। কারণ নিম্নচাপটির কেন্দ্রের ও অঞ্চলটির বাইরের চাপের পার্থক্য যত বেশি হবে নিকটবর্তী বায়ুপ্রবাহের বেগও তত বৃদ্ধি পাবে।

বায়ুর বেগের মান অনুযায়ী নিম্নচাপকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। (১) নিম্নচাপ (প্রতি ঘণ্টায় ৩১ কিমির চেয়ে কম), (২) গভীর নিম্নচাপ (ঘণ্টায় ৩১-৬১ কিমি), (৩) সাইক্লোন (ঘণ্টায় ৬২ কিমি ও তার চেয়ে বেশি)। নিম্নচাপ বা সাইক্লোন মূল ভূখণ্ডে ঢুকে সমুদ্র উপকূল থেকে যত ভিতরের দিকে সরতে থাকে তখন দুটো কারণে তার শক্তি ক্রমশ কমতে থাকে। প্রথমত ভূখণ্ডের অসমতল ভূমি, গাছপালা, পাহাড় ইত্যাদির সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে বায়ুর বেগ কমে যায়; দ্বিতীয়ত সমুদ্রের সঙ্গে যোগ ছিন্ন হওয়ায় জলীয় বাষ্পের জোগানও যায় কমে, ফলে ঘনীভবনের যে তাপশক্তি পাওয়া যেত সেটাও হ্রাস পায়।

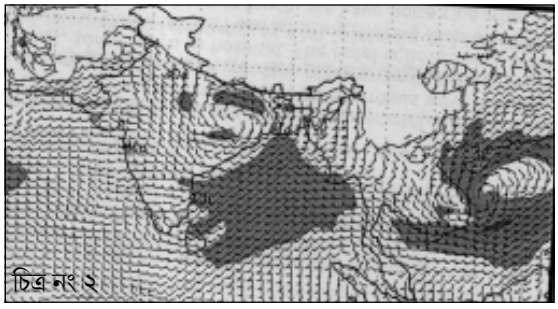

চিত্র নং ২

আবহাওয়াবিদ কখনও কখনও আসন্ন ঝড়-বাদলের হেতু হিসেবে নিম্নচাপের কথা বলে থাকেন, কখনও বা নিম্নচাপের বদলে ঘূর্ণাবর্তের কথা উল্লেখ করেন। তাই নিম্নচাপ ও ঘূর্ণাবর্ত সমার্থক হতে পারে। পার্থক্যটা বোঝাবার জন্য ২নং চিত্রটি উপরে দেখান হয়েছে। চিত্রটিতে ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১০০০ ফুট উপরে বায়ুপ্রবাহের বিন্যাস দেখা যাচ্ছে। বায়ুপ্রবাহের গতিমুখ বোঝাতে চিরুনির মতো একটা সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যাখ্যাস্বরূপ বলা যতে পারে, বিহারের উত্তরাঞ্চলে বায়ু পূর্ব থেকে

পশ্চিম দিকে, মায়ানমারে দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে ও আরব সাগরে মহারাষ্ট্র উপকূলে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। চিরুনির দাঁতগুলি দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে বায়ু-বেগের মান।

ঘূর্ণাবর্ত বলতে উত্তর গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার **বিপরীত দিকে** ঘূর্ণায়মান বায়ু-প্রবাহকে বোঝায়। চিত্রটিতে ঝাড়খণ্ডের উপর একটি ঘূর্ণাবর্ত দেখা যাচ্ছে, ভিয়েতনামের পূর্বে দক্ষিণ চীন সাগরে আর একটি। কখন কখন বায়ুমণ্ডলে ঘূর্ণাবর্ত দেখা গেলেও ভূপৃষ্ঠে নিম্নচাপ তৈরি হয় না। কিন্তু ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে বৃষ্টি-বাদলের আভাস দেন, কখনও বা ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে। সাধারণভাবে বলতে গেলে নিম্নচাপ ও ঘূর্ণাবর্তের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। তেমনি উচ্চচাপ ও বিপরীত ঘূর্ণাবর্তের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। উত্তর গোলার্ধে **ঘড়ির কাঁটার দিকে** ঘূর্ণায়মান বায়ু-প্রবাহকে **বিপরীত ঘূর্ণাবর্ত** বলা হয়। উপরের চিত্রে আন্দামান সাগরে সুমাত্রা দ্বীপের উত্তরে একটি বিপরীত ঘূর্ণাবর্ত দেখা যাচ্ছে।

আবহাওয়াবিদের ব্যবহৃত কতকগুলি শব্দ দিয়ে বায়ুমণ্ডলের কী অবস্থা বোঝায় আশা করি তার একটা একটা ছবি তুলে ধরা গেছে। এই অবস্থায় আবহাওয়া কেমন হবে সেটা তাঁরা বলেও দেন। ধরা যাক, বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল থেকে একটা গভীর নিম্নচাপ উত্তর-পশ্চিম দিকে সরে সন্ধ্যা নাগাদ দীঘার কাছে মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করবে ও ক্রমে দুর্বল হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত্রি ক্রমে গভীর হতে চলল। ঝড় ও বৃষ্টির প্রতাপ কমার কোনো লক্ষণ নেই। আপনি কলকাতায় বসে ভাবছেন, নিম্নচাপ কি এখনও সমুদ্রে, না উপকূল অতিক্রম করে ঝাড়খণ্ডে পৌঁছে গেল? আগামী কাল হাওড়াতে ট্রেন ধরতে পারবেন তো?

এই মুহূর্তে আপনি আবহাওয়াবিদের পরামর্শ পাচ্ছেন না। কিন্তু নিজে কিছু আন্দাজ করতে পারছেন কি? উপরের ছবি দুটো যদি ভাল করে লক্ষ্য করেন তাহলে কিন্তু নিজেও মোটামুটি একটা আন্দাজ করতে পারবেন কর্মনাশা নিম্নচাপটি সমুদ্র উপকূল অতিক্রম করে কতটা উত্তর-পশ্চিম দিকে সরে গেছে। আবহাওয়া বিজ্ঞানের সূত্রানুসারে **বায়ু যেদিকে প্রবাহিত হচ্ছে সেদিকে মুখ করে দাঁড়ালে আপনার বাঁ দিকে পড়বে নিম্নচাপ ও ডানদিকে উচ্চচাপ অঞ্চল**।

আবার বর্তমান সমস্যাটিতে ফিরে আসা যাক। যদি লক্ষ্য করে থাকেন তবে আপনার মনে পড়বে, বৃষ্টি শুরু হওয়ার ২/১ দিন আগে থেকেই পূবালী (পশ্চিমমুখী) হাওয়া চলছিল। এতে বোঝায় নিম্নচাপটি আপনার অবস্থানের দক্ষিণ দিকে ছিল। (উপরে বলা সূত্রের সঙ্গে মিলিয়ে পরীক্ষা করতে থাকুন।) নিম্নচাপটি দীঘার কাছে অবস্থান করলে কলকাতায় বায়ুর গতি হওয়া উচিত দক্ষিণ-পূর্ব থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে। বায়ুপ্রবাহ দক্ষিণ থেকে উত্তরমুখী হলে নিম্নচাপটি পশ্চিমদিকে আপনার অবস্থানের একই অক্ষাংশে পৌঁছে গেছে। এটি আরও উত্তরে সরে গেলে বায়ুর গতি মুখ হবে দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে। এবার নিজেই আপনার সমস্যার সমাধান করুন। বায়ুর গতিমুখ নির্ণয় করে কোন্ দিকে নিম্নচাপটি অবস্থান করছে সেটা বুঝে নিন। আপনার অবস্থান থেকে নিম্নচাপটির দূরত্ব বেড়েছে কিনা সেটা বোঝা যাবে বায়ুর গতিবেগ দেখে। দূরত্ব বাড়লে বায়ুর বেগ স্বভাবতই কমে যাবে, তবে বৃষ্টিপাত তখনই বন্ধ নাও হতে পারে।

বায়ুর গতিমুখ জানতে একটা খোলা জায়গায় যাওয়াই ভাল —যেমন খোলা মাঠ বা বাড়ির ছাদ, যাতে বায়ুপ্রবাহ কোনো দিক থেকে বাধা না পায়। আপনার কাছে দিক নির্ণয়ের যন্ত্র নেই। কী করবেন? একটা রুমাল নিন। একটা কোনা ধরে রুমালটি ঝুলিয়ে দিন। দেখুন রুমালের অন্য প্রান্তটি কোন দিকে যাচ্ছে। অথবা একটা কাগজকে ছোট ছোট টুকরো করে নিন। একটু উপর থেকে কাগজের টুকরোগুলো ছেড়ে দিন। দেখুন টুকরোগুলো কোন দিকে ভেসে যাচ্ছে। ব্যস, বায়ুর গতিমুখের একটা মোটামুটি ধারণা পেয়ে গেলেন। এটাও যদি সম্ভব না হয়, তবে দেখুন ঘরের কোন্ জানালা দিয়ে বাতাস ঢুকছে। পূব দিকের জানালা দিয়ে বাতাস আসা মানে বায়ুর গতি পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে। পূব ও দক্ষিণ দুটো জানালা দিয়েই যদি বাতাস পান তাহলে বোঝা গেল বাতাস দক্ষিণ-পূর্ব থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে যাচ্ছে। তবে মনে রাখবেন আপনার বাড়ির পাশে যদি অন্য কোন বাড়ি অথবা বাতাসকে বাধা দিতে পারে এমন কিছু থাকে তবে আপনার সিদ্ধান্ত সঠিক নাও হতে পারে। আরও একটা কথা মনে রাখবেন, বায়ুপ্রবাহ সর্বদা অস্থির; এর বেগ যেমন মিনিটে মিনিটে বাড়ে-কমে, তেমনি গতিমুখও একবার কিছুটা বাঁ দিকে আবার পরক্ষণেই ডানদিকে বদলে যায়। এদের গড় অবস্থান মূল প্রবাহের দিক নির্দেশ করে। **উমা**

পরবর্তী অংশ আগামী সংখ্যায়

উৎস মানুষ পত্রিকা ও বই
পেতে যোগাযোগ করুন
দীপক কুণ্ডু
২৯/৩ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন
কলকাতা- ৭০০০১২
(কর্পোরেশন অফিসের পাশের গলি)
ফোন নং - ৯৮৩০২৩৩৯৫৫

ত্বকের রোগ ও খাদ্যভাবনা

জয়ন্ত দাস

আচ্ছা ডাক্তারবাবু তাহলে কী কী খাবো না ...

—সে কি সব খাব বলছেন!

—আমি তো বাইরের জিনিস খাই-ই না। তবু কেন অ্যালার্জি বেরোচ্ছে?

কথায় বলে 'ওষুধ-পথ্য'। আমাদের সংস্কৃতিতে চিকিৎসার অঙ্গ হিসেবে কী খাব আর কী খাব না সেটা খুব দরকারি তথ্য। ব্যাপারটা খুব ভুল নয়। বিশেষ করে দিন দিন ডায়াবেটিস, হার্টের রোগ, কোলেস্টেরলের আধিক্য, ওবেসিটি (মোটা হওয়া) যেভাবে বাড়ছে তাতে আমাদের খাওয়াদাওয়া সম্পর্কে কিঞ্চিৎ সাবধানে থাকাই ভাল। কিন্তু এর উল্টো দিকটা হল, সব কিছু রোগ-বালাইকে খাদ্যঘটিত বলে ধরে নেওয়া। আমার মনে হয় এ ব্যাপারে ত্বকরোগী আর হৃদরোগীরা সবচেয়ে বেশি খুঁতখুঁতে। হৃদরোগীদের কথা থাক, কেন না সে ব্যাপারে আমার জ্ঞানগম্যি কম, ত্বকরোগীদের কথায় আসা যাক।

কয়েকটি বিরল ত্বকরোগের ক্ষেত্রে খাদ্যের ভূমিকা অনেকখানি। যেমন ডার্মাটাইটিস হারপিটিফরমিস। এটি বেশ বিরল ত্বকরোগ, চামড়ায় ছোটো ছোটো ফোস্কা হয় আর চুলকায়। গ্লুটেন নামক একটি প্রোটিন এই রোগে খাওয়া বারণ। গ্লুটেন থাকে গম, বার্লি, রাই জাতীয় খাবারে। এসব খেলে রোগীর ফোস্কা আর চুলকানি বেড়ে যায়। কিন্তু আগেই বলা হল, এই রোগীর সংখ্যা খুব কম, যেসব ত্বকরোগী কী খাব আর কী খাব না নিয়ে ডাক্তারকে ব্যতিব্যস্ত করেন, তাঁদের অধিকাংশই জীবনে ডার্মাটাইটিস হারপিটিফরমিস চোখেই দেখেন নি, দেখবার সম্ভাবনাও খুব কম। তাঁদের প্রশ্ন অ্যালার্জি নিয়ে, একজিমা নিয়ে, ব্রণ নিয়ে—মানে যে সব ত্বকরোগ আমরা দুবেলা দেখে থাকি। দেখা যাক, সেইসব রোগে খাবারের ভূমিকা কী বা আদৌ কোনও ভূমিকা আছে কি না।

ব্রণ: প্রথমে ব্রণ নিয়ে বলি। কেন না এটা বোধ করি সবচেয়ে সাধারণ ত্বকরোগ। উঠতি বয়সে দু-একটা ব্রণ হয় নি এমন মানুষ পাওয়া ভার। ব্রণ নিয়ে গড়পড়তা বাঙালির ধারণা, পেট পরিষ্কার না থাকলে ব্রণ হয়। খবরের কাগজ, স্বাস্থ্য পত্রিকা বা টেলিভিশনে যে সব রূপ-বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দেন, বিউটি পার্লারে যাঁরা মূল্যবান টিপস দিয়ে আমাদের সৌন্দর্যবৃদ্ধিতে অশেষ অবদান রেখে থাকেন, তাঁদের সবার এক রা —ব্রণ! আপনার পেট পরিষ্কার আছে তো? খালি পেট পরিষ্কার নিয়েই এক মহাভারত লেখা যায়। সেই মহাভারত ব্যাখ্যান করার অবসর এ প্রবন্ধে নেই। শুধু এটুকু বলে রাখি আমার রোগীদের মধ্যে কেউ কেউ সপ্তাহে মাত্র দু-দিন মলত্যাগ করেন বলে কাতর যে তাঁদের পেট পরিষ্কার হয় নি, আর কেউ কেউ দিনে সাতবার মলত্যাগ করে কাতর, কেন না তাঁদেরও পেট পরিষ্কার হয় না! আর মজার ব্যাপার হল, ব্রণর রোগীদের অনেকেই খুব ভক্তিভরে বিশ্বাস করেন যে, পেট পরিষ্কার না থাকাটাই তাঁদের ব্রণর কারণ আর সে সমস্যার মূলোৎপাটন না করে ওপর ওপর চিকিৎসা করে ব্রণ সারানো ঠিক হবে না। আমার কাছে তাঁরা জানতে চান কী খেলে পেট পরিষ্কার হবে এবং ভেতর থেকে ব্রণ সেরে যাবে। সত্যি কথা বলতে কি, কেবল রূপবিশেষজ্ঞরা-ই যে ব্রণ রোগীদের পেট পরিষ্কার নিয়ে পরামর্শ দেন সেটা বললে সত্যের অপলাপ হবে, অনেক আধুনিক পাস-করা ডাক্তারবাবুও এরকম গভীর বিশ্বাসের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবেন, ঠিক আছে, কিছু ওষুধ দিয়ে মলত্যাগের হারটা বাড়িয়ে রোগীকে আপাতত খুশি করলে দোষের কিছু নেই।

দেখা গেছে গ্রামীণ সভ্যতায় ব্রণ কম হয়, শহরের চাইতে গ্রামে ব্রণর উপদ্রব তুলনায় কম, যে সব জায়গায় পাশ্চাত্য সভ্যতা এখনও থাবা বাগিয়ে জাঁকিয়ে বসতে পারে নি (যেমন এস্কিমোদের মধ্যে, নানা আরণ্যক উপজাতি সমাজে) সেখানে ব্রণ তুলনায় কম। কিন্তু তার জন্য খাদ্যাভ্যাস ঠিক কতটা দায়ী সেটা এখনও নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। জীবনযাত্রার আরও পাঁচরকমের ব্যাপার আছে, যেমন সামাজিক চাপ ও টেনশনের ধরন সেই সব সমাজে অন্যরকম, আর টেনশনে অনেকের ব্রণ বাড়ে। তবু অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন, কিছু খাদ্য, বিশেষ করে যে সব খাদ্যের 'গ্লাইসেমিক ইনডেক্স' বেশি, অর্থাৎ যে সব খাবার খেলে তাড়াতাড়ি রক্তে গ্লুকোজ বেড়ে যায়, সে সব খাবার ব্রণ বাড়ায়। আপাতত এটি বৈজ্ঞানিকদের বিবেচনাধীন একটি বিষয়, ব্রণর রোগীরা যদি এটা জেনে মিষ্টি, কোল্ড ড্রিংকস্, আইসক্রীম, ফাস্ট-ফুড ছেড়ে দিতে চান তো আমি বলব, ব্রণ কমুক আর না কমুক, এগুলো ছেড়ে দিলে সার্বিক স্বাস্থ্যের দিক থেকে তাঁরা লাভবানই হবেন। একদিন যদি নিশ্চিতভাবে জানা যায়ও এসব খেলে ব্রণ বাড়ে না, তবু রোগীর ক্ষতি কিছু নেই, তাঁর মোটা হবার ক্ষতিকর প্রবণতা তো কমল, কমল হৃদরোগের সম্ভাবনাও। সুতরাং মিষ্টি, কোল্ড ড্রিংক ইত্যাদিকে আপাতত কমানোই ভাল,

কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমাদের মাথায় রাখতে হবে এসবে ব্রণ বাড়ে এটা প্রমাণিত সত্য এখনও নয়। একই ভাবে, শাক-সব্জি, ফল, জল এসব বেশি খেতে বলা যেতে পারে, বিশেষ করে ব্রণ থাকাকালীন রোগী এই উপদেশ মানার সম্ভাবনা বেশি; কিন্তু এগুলো খেলে ব্রণ কমে এমন প্রমাণ এখনও যথেষ্ট নয়।

ব্রণর খুব কাছাকাছি দেখতে একটা অসুখ আছে, তাকে আগে বলা হত 'রোজাসিয়া ব্রণ' (Acne Rosacea), এখন অবশ্য কেবল 'রোজাসিয়া'-ই বলা হয়। ব্রণর চাইতে অনেক বিরল হলেও এটা একেবারে খুব বিরল অসুখ নয়, আর অনেক রোজাসিয়া রোগীকে এখনও ডাক্তারবাবুরা ভুল করে সাধারণ ব্রণ বলে নির্ণয় করেন। রোজাসিয়া-তে কিন্তু খাদ্যের সুনির্দিষ্ট ভূমিকা আছে। কফি, চা, মদ, তামাক, মশলাদার খাবার এসব খেলে রোজাসিয়ার উপদ্রব বেড়ে যায়।

একজিমা : ব্রণ নিয়ে বলতে গিয়ে ইচ্ছে করেই খানিকটা এদিক ওদিক কথা বলেছি কেবলমাত্র ব্রণর চিকিৎসা বা পথ্যের সঙ্গে যুক্ত নয়। কথাগুলো দিয়ে আমি এই আভাসটা দিতে চেয়েছি যে, বিগত বছর কুড়ি ধরে খুব দ্রুতবেগে আধুনিক চিকিৎসার অভ্যন্তরে, তার মনন জগতে, কিছু তাত্ত্বিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে —রোগী কেন, পুরোনো চিকিৎসকেরা পর্যন্ত এই পরিবর্তনের হাওয়ায় কিঞ্চিৎ দিশেহারা। বর্তমানে আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্র সাক্ষ্য প্রমাণের ওপর অনেক বেশি নির্ভর করে; যত দিন যাচ্ছে আন্দাজি, অনুমাননির্ভর, তত্ত্বনির্ভর, অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মতামত-নির্ভর চিকিৎসার গুরুত্ব ততই কমে আসছে। আজ থেকে কুড়ি বছর আগে যেসব অনুমানকে যুক্তিযুক্ত বলে মনে করা হত এবং সেই অনুমাননির্ভর উপদেশ রোগীদের হরদম দেওয়া হত, আজকের চিকিৎসকের কাছে সে সব অনেক সময়েই অতীতের অনভিপ্রেত বোঝা বলে মনে হচ্ছে। পথ্য নিয়ে আগেকার ডাক্তারবাবুরা যেমন নির্দ্বিধায় তাঁদের মাস্টারমশাইদের কাছে শোনা কথাগুলো রোগীদের বলতেন, আজ সেরকম বলতে গেলে চিকিৎসকদের নিজেদের মনে প্রশ্ন জাগছে—বলছি তো, কিন্তু এর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ কোথায়?

একজিমা এর জ্বলন্ত উদাহরণ। পঁচিশ বছর আগে দেখেছি আমাদের মাস্টারমশাইদের অধিকাংশই যে কোনো একজিমাতে ডিম, বেগুন, চিংড়ি, কাঁকড়া ইত্যাদি খাওয়া একেবারে নিষেধ করে দিতেন, আর কেউ কেউ কলাই ডাল, পুঁইশাক, কেউ বা পেঁয়াজ-রসুনকে নিষিদ্ধ তালিকায় ফেলতেন। তাই আজকের রোগীকে আমরা যখন বলি—ও সব খেলেই আপনার রোগ বাড়বে তেমন প্রমাণ নেই, যদি কিছু খেলে সুনির্দিষ্টভাবে বোঝা যায় যে আপনার রোগের উপদ্রব বেড়ে যাচ্ছে সেটা খাওয়া তখন বন্ধ করতে হবে—তখন রোগী প্রায়ই আমাদের কথায় ভরসা করতে পারেন না। 'কিছু খেলে সুনির্দিষ্টভাবে বোঝা যায় রোগের উপদ্রব বেড়ে যাচ্ছে'—এটাও অত্যন্ত নড়বড়ে কথা, কেন না একজিমা জাতীয় রোগ অনেক সময়ে কোনও কারণ ছাড়াই বাড়ে ও কমে, অনেক সময় খাদ্য ছাড়া অন্য কারণে কমে-বাড়ে। রোগী কী করে বুঝবেন খাদ্য থেকে বাড়ল না অন্য কারণে বাড়ল?

আসলে একজিমা একটা মাত্র রোগ নয়, এটা হল বেশ কিছু রোগকে একসঙ্গে করে দেওয়া নাম। যেমন ধরুন আপনার কব্জিতে চুলকায়, রস কাটে, আপনি দেখলেন আপনার হাতে ঘড়ি খুলে রাখলে আর কোনও সমস্যা নেই; ঘড়ির ধাতব ব্যান্ড বদলে চামড়ার ব্যান্ড করে দিতেই সমস্যা উধাও! আপনার হয়েছিল স্পর্শজনিত একজিমা, ধাতু (খুব সম্ভব নিকেল) থেকে। ডিম খাওয়া ছেড়েই দিন আর দিনে দশটা করে ডিমই খান, কিচ্ছু যাবে আসবে না। অথচ হয়তো বা টিনের পাত্রে সংরক্ষিত খাবার খেলে আপনার শরীরে চুলকাবে, র‍্যাশও দেখা দিতে পারে; কারণ টিনের পাত্রে নিকেল থাকে, সেটা কারও কারও ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করতে পারে।

আবার যে ধরনের একজিমা চট করে সারতে চায় না, সাধারণত বাচ্চা বয়সে দেখা দেয়, পরিবারে (বা রোগীর নিজেরও) একজিমা, হাঁপানি বা অ্যালার্জিক হাঁচি-কাশির প্রবণতা থাকতে পারে, সেই 'অ্যাটোপিক একজিমা'-তে কী খাওয়া নিষেধ করলে ভাল হয় সে নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে। মাতৃদুগ্ধ বাদে অন্য দুধ, ডিম, বেগুন, চিংড়ি, সামুদ্রিক নানা মাছ ও কাঁকড়া-জাতীয় প্রাণী ও নানা ধরনের বাদাম থেকে অনেক রোগীর 'অ্যাটোপিক একজিমা'-র প্রকোপ বাড়ে বলে দেখা গেছে। অনেকের বাড়ে, কিন্তু সকলের নয়; আবার, কোনো 'অ্যাটোপিক একজিমা' রোগীর ঠিক কোন খাদ্যে অসুবিধা হবে সেটা নির্দিষ্ট করে ধরতে গেলে তার রোগের হ্রাস-বৃদ্ধির পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিহাস ও ল্যাবরেটরি পরীক্ষা দরকার। এদেশে চিকিৎসকদের অনেক সময়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা ছাড়া উপায় থাকে না, রোগের হ্রাস-বৃদ্ধির ইতিহাসের ওপর ভরসা করেই কী কী খাওয়া চলবে না তা বলতে হয়।

একজিমার বাকি নানা ধরনের সঙ্গে খাদ্যের সম্পর্ক কম। তবু প্রতিটি রোগীকে তাঁর নিজস্বতা অনুযায়ী খুঁটিয়ে দেখতে হয়। যেমন বৃদ্ধবয়সে ত্বক শুষ্ক হয়ে ফেটে যায়, চুলকায়, রসও বেরোতে পারে—এটাও এক ধরনের একজিমা। দেখতে হবে রোগী যথেষ্ট জল খাচ্ছেন কিনা, বা তাঁর অন্য কোনও রকম ভিটামিন বা খনিজ লবণ ইত্যাদি পুষ্টি পদার্থের অভাব আছে কিনা। যেমন জিঙ্ক বা দস্তার অভাব থেকে শুকনো একজিমার মতো এক ধরনের ত্বকরোগ হতে পারে, ভিটামিন এ-র অভাবে ত্বকের শুষ্কতা ও লোমকূপে খরখরে ভাব হতে পারে। সমস্ত ধরনের একজিমার সঙ্গে সমস্ত খাদ্যের সম্ভাব্য সম্পর্ক নিয়ে পুরো আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয়, সে জন্য ডাক্তারি বই

পড়তে হবে, কিন্তু কয়েকটা সাধারণ ধারণার সঙ্গে পরিচিত হয়ে থাকা ভাল। তাহলে ডাক্তারবাবু যখন আপনাকে খাদ্য নিয়ে উপদেশ দেবেন সেগুলো বুঝতে সুবিধা হবে, এবং পুরোনো বাতিল হয়ে যাওয়া ধারণাগুলো নিয়ে ডাক্তারবাবুকে বারবার প্রশ্ন করতে হবে না।

আমবাত বা আরটিকেরিয়া : রোগীরা প্রায়ই এসে আমাদের বলেন —আমার ভীষণ অ্যালার্জি। মুশকিল হল, অ্যালার্জি কথাটা কোনও একটা নির্দিষ্ট রোগের নাম নয়। অ্যালার্জি থেকে চুলকাতে পারে, হাঁচি-কাশি হতে পারে, শ্বাসকষ্ট হতে পারে —হতে পারে আরও অনেক কিছুই। এমন কি একটু আগেই আমরা দেখেছি, নিকেল অ্যালার্জি থেকে ত্বকে একজিমা হতে পারে, আর আমরা প্রায়ই দেখি, কসমেটিকে অ্যালার্জি, বিশেষ করে চুলের কলপে অ্যালার্জি থেকে একজিমা হয়। কিন্তু ত্বকরোগীরা অ্যালার্জি কথাটা অধিকাংশ সময়ে যে রোগটার সম্পর্কে ব্যবহার করেন তার পোষাকি নাম 'আমবাত' (Urticaria)। যদিও আম খাবার সঙ্গে এর কোনো সম্বন্ধ নেই। এ রোগে কোনও আপাত কারণ ছাড়াই ত্বক লালচে দেখায়, চুলকায় ও ফুলে যায়, আর সাধারণত কিছুক্ষণ পরে সেটা ঠিকও হয়ে যায়। অনেকেই খুব নির্দিষ্ট করে ধরতে পারেন যে কোনও নির্দিষ্ট কিছু খাবার পরেই তাঁকে এই রোগটা আক্রমণ করে; বিশেষ করে ডিম, বেগুন, চিংড়ি, কাঁকড়া, সামুদ্রিক খাবার থেকে এটি বেশি হয়। আবার বিভিন্ন ধরনের বাদাম, বিন, সর্ষে, দুধ ও মশলায় আমবাত হতে পারে। সত্যি কথা বলতে কি, প্রায় সমস্ত খাদ্য থেকেই আমবাত হওয়া সম্ভব, কিন্তু উপরোক্ত খাদ্যে সে সম্ভাবনা বেশি। এসব রোগীরা যদি ঐ বিশেষ খাবার এড়িয়ে চলেন তাহলে সেটাই তাঁর যথার্থ ও যথেষ্ট চিকিৎসা। এ ছাড়া খাদ্যে মেশানো হয় এমন নানা রঙ ও প্রিজারভেটিভ থেকে আমবাত হতে পারে; যেহেতু একই রঙ বা প্রিজারভেটিভ নানা খাদ্যেই মেশানো থাকতে পারে তাই এসব ক্ষেত্রে ঠিক কোন রঙ/প্রিজারভেটিভ কার অ্যালার্জি সেটা জোর দিয়ে বলতে গেলে পরীক্ষা করাতে হয়, পরীক্ষা খরচসাপেক্ষ ও পুরো নির্ভরযোগ্য নয় বলে অনেক সময় সমস্ত খাদ্য-রঙ/প্রিজারভেটিভ এড়িয়ে চলতে বলা হয়। সেটা সহজ ব্যাপার নয়, আর মনে রাখতে হবে খাদ্য-রঙ অনেক ক্ষেত্রে ওষুধেও ব্যবহৃত হয়, সেখানে ওষুধের রঙে অ্যালার্জি না ওষুধের ওষুধ দ্রব্যটিতেই অ্যালার্জি সেটা বোঝা খুব শক্ত হয়ে পড়ে।

সব আমবাত খাদ্য থেকে হয় না। খাদ্য ছাড়া অন্য 'অ্যালার্জেন' থেকে তা হতে পারে, যেমন বাড়ির ধুলোয় থাকা এক ধরনের কীটের দেহাংশ, যা শ্বাসের মধ্য দিয়ে আমাদের শরীরে ঢোকে। আবার দেহের ভিতরের অন্য কোনও রোগের লক্ষণ হিসেবে আমবাত দেখা দিতে পারে। কিন্তু আমবাতের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর কোনও কারণই খুঁজে পাওয়া যায় না। এরকম আমবাত যে শুধু কোনও খাদ্য থেকেই হয় না তাই নয়, আমাদের জানা কোনও কারণের সঙ্গেই তার সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না। এইসব রোগীরা অনেকেই অন্য আমবাত রোগীর দেহে খাবার থেকে আমবাত হয় এটা দেখেছেন। সুতরাং তাঁরা ধরেই বসে থাকেন যে তাঁদের আমবাতটাও কোনও এক খাদ্যে অ্যালার্জি। তাঁরা নিজের জন্য অদ্ভুত অদ্ভুত সব খাবার বা তালিকা তৈরি করেন আর বারংবার হতাশ হন। আর তাঁদের বিশ্বাস এতই দৃঢ় যে, তাঁরা কখনও মানতেই চান না খাবারের সঙ্গে তাঁদের রোগের সম্পর্ক নেই —সেটা বললে তাঁরা বরং ডাক্তার বদলান, বিশ্বাস বদলান না।

শেষকথা : অনেক ত্বকরোগের সঙ্গে খাদ্যের সম্পর্ক রয়েছে, তবে অধিকাংশের সঙ্গেই নেই। ত্বকরোগ হলেই কী খাওয়া বারণ সে লিস্টি ডাক্তারের কাছে পেতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। আর আপনার খাবার নিয়ে যে ধারণা গুরুজন বা বন্ধুবান্ধবের কথা শুনে গড়ে উঠেছে তার অনেকটাই চিকিৎসাশাস্ত্রের বিচারে ভুল —সেটা বুঝে নিলে অনেক হয়রানি থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে। সমস্ত ত্বকরোগের সঙ্গে খাদ্যের সম্পর্ক নিয়ে এখানে স্বাভাবিক কারণেই আলোচনা করার চেষ্টা হয় নি, করলে সেটা ডাক্তারি বই হয়ে যেত। যে কটি রোগ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সে কটি নিয়েও সব কথা বলা যায় নি, ঐ একই কারণে। এই লেখায় বেশিরভাগ ত্বকের রোগের সঙ্গে খাওয়াদাওয়ার আদৌ যে কোনো সম্পর্ক নেই, সে সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে মাত্র। উমা

বাণিজ্যিক নয় মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক পত্রিকা।

প্রাপ্তিস্থান: পাতিরাম, বুকমার্ক, পিপল্‌স বুক সোসাইটি, বই-চিত্র, অম্লান দত্ত বুক স্টল (বিধাননগর পুরসভা), শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র (চেঙ্গাইল), ডাঃ শুভজিত ভট্টাচার্য (উষুমপুর মিনিবাস স্ট্যান্ডের কাছে, আগরপাড়া)। শেয়ালদা মেন সেকশনের বিভিন্ন বইয়ের স্টল।

পাঠক এবং এজেন্টদের যোগাযোগ করার ফোন নম্বর: ৯৮৩০৯-২২১৯৪ বা ৯৩৩১০-১২৬৩৭।

বাইপাস অপারেশন, না চিকিৎসার প্রহসন

গৌতম মিস্ত্রি

সুন্দরবনের বাসিন্দা, বছর চল্লিশের এক ভদ্রমহিলা বুকের ব্যথায় ভুগছিলেন। স্থানীয় চিকিৎসকের চিকিৎসায় মন্দ ছিলেন না। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত পরিবারবর্গ মিডিয়া আর বিজ্ঞাপনের দৌলতে, আজকাল চিকিৎসা বিষয় উপদেশ কেবলমাত্র পারিবারিক চিকিৎসকের উপর নির্ভরশীল নয়। এঁরা কলকাতায় এলেন। কাগুজে বিজ্ঞাপনে আর রাস্তার মোড়ের হোর্ডিংয়ে রোগমুক্তির মূল্য দেওয়াই থাকে। এঁরা আরও জানতে পারলেন, দেরি মোটেই করা যাবে না। নিজেদের এই প্রচেষ্টাকে ধন্যবাদ দিয়ে ভাবলেন, এ যাত্রা বোধহয় আত্মীয়া বেঁচেই গেলেন। এক বেসরকারি হাসপাতালে খুব সহজেই চিকিৎসা শুরু হয়ে গেল। চিকিৎসকের সঙ্গে যথেষ্ট মানবিক আলোচনার সুযোগ না পেলেও, তৎপরতার সাথে নানাবিধ পরীক্ষানিরীক্ষা সারা হল দু'দিনের মধ্যেই। রোগীর পরিবারবর্গ বিস্ময়ের সাথে দেখলেন, স্বল্পভাষী গম্ভীর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক খুব বিশ্বাসযোগ্যভাবে কমপিউটারে চলমান ছবিতে প্রথমে হৃদস্পন্দন দেখালেন ও পরে একটা সরু রক্তনালী দেখালেন। রোগীর পরিবারবর্গ যেটুকু বুঝলেন, ভয় পেলেন তার চেয়ে দশগুণ। উপলব্ধি করলেন, আত্মীয়াকে বাঁচাতে হলে ৭০ শতাংশ সরু হয়ে যাওয়া রক্তনালীতে অ্যানজিওপ্লাস্টি করে স্টেন্ট (ওষুধ মেশানো এক ধরনের খাঁচা, যেটা সদ্য মোটা করে দেওয়া রোগগ্রস্ত রক্তনালীকে পুনরায় সরু হতে বাধা দেয়) প্রতিস্থাপন করতে হবে। চিকিৎসার খরচের এই বহরটা বিজ্ঞাপনে ছিল না। এঁরা প্রস্তুতও ছিলেন না। ঋণভারে জর্জরিত পরিবারটি সুদৃশ্য মলাটে বন্দী একতারা কাগজ ও একটি অ্যানজিওপ্লাস্টির চাকতি (সিডি) নিয়ে অচেনা শহরে দিশেহারাভাবে ঘুরতে লাগলেন। উপরের ঘটনাটা কল্পিত নয়, নাম উল্লেখ না করে নিজের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা পেশ করলাম। ঘটনাটার পরবর্তী অংশটিতে নাটকীয়তা নেই। কারণ রোগীর বুকের ব্যথার কারণটা মামুলি, হৃদরোগ নয়। এটা বোঝার জন্য রোগীর সাথে কথা বলাটাই যথেষ্ট আর সন্দিহানদের সন্দেহমুক্ত করার জন্য অপেক্ষাকৃত সস্তার পরীক্ষা (ট্রেডমিল টেস্ট) আছে। হৃদপিন্ডের রক্তনালীতে ব্লকমাত্রই যে বাইপাস অপারেশন অথবা অ্যানজিওপ্লাস্টিযোগ্য হৃদরোগ নয়, পরবর্তী আলোচনায় সেটা নিবেদনের চেষ্টা করব।

বাইপাস অপারেশন অথবা অ্যানজিওপ্লাস্টি, সামগ্রিকভাবে যে চিকিৎসা পদ্ধতিগুলোকে রিভাস্কুলারাইজেশন বলা হয়, তাতে হৃদরোগ সারে কী? পিত্তথলিতে পাথর, অথবা প্রাথমিক পর্যায়ের কতিপয় কর্কট (ক্যান্সার) রোগ হলে নির্দ্বিধায় শল্য চিকিৎসা প্রয়োগ করা হয়, কারণ সে ক্ষেত্রে রোগ নিরাময় সম্ভব। হৃদরোগের ক্ষেত্রে তেমনটি হবার নয়। কারণ হৃদরোগের ক্ষেত্রে, রোগের লক্ষণ প্রকাশ হবার পর, সেটা আর আঞ্চলিক রোগ থাকে না। হৃদরোগের সুচিকিৎসার এই আপাতজটিল সিদ্ধান্ত নেবার দায় নিয়ে আম জনতার মাথা ঘামানোর প্রয়োজন হত না, যদি হৃদরোগ সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা মেশানো ভ্রান্ত ধারণা না থাকত, আর সেটাকে অধিকাংশ অসৎ চিকিৎসা পরিষেবা অপব্যবহার না করত। হার্ট অ্যাটাক বা হৃদরোগে আক্রান্ত হবার ঘটনা বেশ বেড়ে গেছে। এটা বোঝার জন্য পরিসংখ্যানের প্রয়োজন হয় না। বিগত ৫০ বছরে সারা বিশ্বে হৃদরোগীর সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। ভারতে এই বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাচ্ছে গত তিন দশক ধরে। যদিও এটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিরোধযোগ্য, আজকের আলোচনাটা হৃদরোগে আক্রান্ত হবার পরের প্রমাণ নির্ভর চিকিৎসা বিষয়েই সীমাবদ্ধ রাখবো।

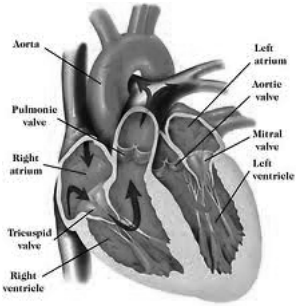

হৃৎপিণ্ড একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পাম্প, যেটির নকল মানুষ এখনো তৈরি করতে পারে নি। হৃৎপিণ্ডের মধ্যেকার প্রত্যঙ্গগুলোর সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা অবান্তর। এটুকু জানলেই প্রাসঙ্গিক যে, হৃৎপিণ্ড নামক পাম্পটির মধ্যে দুটো ভাগ আছে। ডান দিকের পাম্পটা ব্যবহৃত (নামকরণ ভেদে দূষিত) রক্ত শরীরের সমস্ত অংশ থেকে টেনে এনে ফুসফুসে পাঠায় অক্সিজেন সংগ্রহ ও কার্বনডাই অক্সাইড বর্জনের জন্য। বামদিকের পাম্পটা ফুসফুস থেকে পরিশোধিত রক্ত সংগ্রহ করে শরীরের সমস্ত অঙ্গে পাঠায় পুনরায় ব্যবহারের জন্য।

হৃৎ পিণ্ডের মধ্যে আছে চারটি প্রকোষ্ঠ। এক একটি পাম্পের ভাগে দুটি করে। বামদিকের পাম্পটির উপর গুরুদায়িত্ব দেওয়া আছে। বাম নিলয় (লেফ্‌ট ভিন্টট্রিকল্), অর্থাৎ যে পাম্পটির বিরামহীন কাজের দৌলতে বেঁচেবর্তে আছি, সেটি একটি কমলালেবুর আকারের গোলাকার বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন মাংসপিণ্ড, যার ভেতরটা ফাঁপা। শরীরের প্রয়োজন অনুযায়ী, নির্ভুলভাবে, অক্সিজেন সংপৃক্ত রক্ত পাম্প করে যায় সুনির্দিষ্ট সময় অন্তর। বামদিকের পাম্পের দুমুখে দুটো ভাল্‌ব। রক্তের স্রোতের বিপরীতে দুইপাতা বিশিষ্ট 'মাইট্রাল্ ভাল্‌ব' রক্তের বিপরীতমুখী স্রোতকে আটকায় আর পাম্প থেকে নির্গমনের পথে 'এওরটিক ভাল্‌ব'

হৃদস্পন্দনের মধ্যবর্তী সময় রক্তকে বাম নিলয়ে ফেরত আসা আটকায়। দক্ষিণ নিলয়ে (রাইট ভেন্টিট্রিকল) ঠিক এমনতরো দুটো ভাল্‌ব আছে ট্রাইকাসপিড ও পালমোনারি নামে। হৃদরোগে আক্রান্ত হবার পর কেউ কেউ প্রশ্ন করেন, ক'টা ভাল্‌ব আক্রান্ত হয়েছে। জেনে রাখা যাক হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীদের ভাল্‌ব অক্ষত থাকে, রোগটা হয় হৃদপিণ্ডের রক্ত সরবরাহকারী রক্তনালীতে।

হৃৎপিণ্ডের বিরামহীন এবং নির্ভুল কাজের জন্য প্রয়োজন সুস্থ-সবল হৃৎপেশী এবং এতে রক্ত সরবরাহকারী নালীগুলোর সুস্থতা। এককভাবে মাংসপেশীর ব্যারাম সাধারণত হয় না। রক্তনালীর অসুখই হৃদরোগের অসুস্থতার প্রধান কারণ। যদিও, হৃৎপিণ্ডের মধ্যে অক্সিজেন এবং রসদ (গ্লুকোজ) সংপৃক্ত রক্তের অভাব নেই, কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মে, হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশী সেই রক্ত ব্যবহার করে না। যেমন ব্যাঙ্ককর্মী ব্যাঙ্কে যে টাকা নাড়াচাড়া করে, সেটা সে ব্যবহার করে না। হৃৎপিণ্ডের এই আলাদা সরবরাহটা আসে আলাদা রক্তনালীর মাধ্যমে। এই রকম প্রধান তিনটি রক্তনালী তার শাখাপ্রশাখার মাধ্যমে হৃৎপেশীকে রক্ত সরবরাহ করে থাকে। এগুলোকে বলে করোনারি আর্টারি।

হৃদরোগে মূলত হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশী অকেজো হলেও, এটা কোনোমতেই এককভাবে কেবলমাত্র হৃৎপিণ্ডের রোগ নয়। মূলত এটা রক্তনালীর রোগ যার বৈজ্ঞানিক নাম অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস। অর্থাৎ, মূল রোগটা হল অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস, আর হৃদরোগ তার বিবিধ রোগের মধ্যে একটি। এই বহুমুখী রোগের বিশেষত্বটা মনে রাখলে হৃদরোগের সুচিকিৎসার যুক্তিগ্রাহ্য আলোচনাটা বোঝা যাবে।

উচ্চরক্তচাপ, মধুমেহ, রক্তে মাত্রাতিরিক্ত কোলেস্টেরল, স্থূলতা, তামাকের ব্যবহার, শারীরিক পরিশ্রম বিমুখতা ইত্যাদি একাধিক অস্বাস্থ্যকর উপাদানের ক্রমাগত এবং সম্মিলিত প্রভাবে রক্তনালীর মধ্যে চর্বিজাতীয় পদার্থ জমতে শুরু করে। ক্রমে ক্রমে চর্বিজাতীয় পদার্থের মাত্রাবৃদ্ধি হতে থাকে আর চর্বিনিঃসৃত ক্ষতিকারক হরমোনের প্রভাবে রক্তনালীর দেওয়ালটা মোটা হতে থাকে এবং রক্তনালীর ভেতরে এক ধরনের ক্ষত সৃষ্টি হয়। রক্তনালীর এই অসুখটা কোনমতেই কেবলমাত্র হৃৎপিণ্ডের কোনো এক ক্ষুদ্র অংশে সীমাবদ্ধ থাকে না বরং হৃৎপিণ্ডের রক্তনালী সহ মস্তিষ্ক, বৃক্ক (কিডনি) এবং পায়ের রক্তনালীতে ছড়িয়ে পড়ে। অর্থাৎ, কেবলমাত্র হৃৎপিণ্ড নয়, সুচিকিৎসার লক্ষ্য হতে হবে সমস্ত রক্তনালী। যেহেতু রোগহীন হৃদয় আর মস্তিষ্কের উপর নীরোগ ও সুস্থ দীর্ঘজীবন নির্ভর করে, এটা মনে করা প্রাসঙ্গিক হবে যে, কর্মস্থলে কর্মক্ষমতা নির্ধারণ অথবা জীবনবীমার প্রিমিয়াম নির্ধারণের ক্ষেত্রে রক্তনালীর বয়সই বিবেচ্য হওয়া উচিত।

হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়াটা আপাতদৃষ্টিতে একটা হঠাৎ দুর্ঘটনা বলে মনে হলেও, চিকিৎসকরা বলে থাকেন, হার্ট অ্যাটাক কখনোই হঠাৎ হয় না; এর পেছনে থাকে বহু বছরের প্রস্তুতি। যে দুর্ভাগা আজ হৃদরোগে আক্রান্ত হল, গড়পড়তা ১০ থেকে ৩০

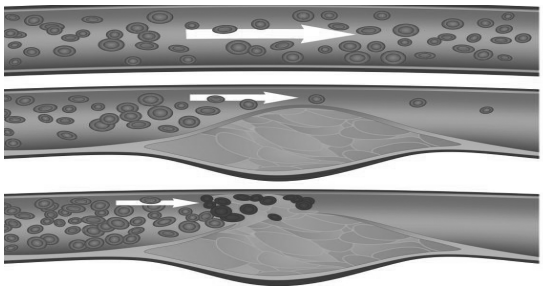

বছরের আগে তার রোগের সূত্রপাত হয়ে গেছে। সচেতনার আলোয় সামাজিক অন্ধত্ব দূর করা গেলে এই মারণ রোগ অনেকাংশে নির্মূল করা যায়। কিন্তু সেটা এক কঠিন কিন্তু আয়াসসাধ্য স্বপ্ন, এক অন্য আলোচনা।

হৃৎপিণ্ডের প্রধান রক্তনালীর (করোনারি আর্টারি) মধ্যেকার রোগের মাত্রা ও ধরণ অনুযায়ী হৃদরোগও প্রধান দুই ধরনের। রক্তনালীর ভেতরটা আংশিক ভাবে বন্ধ (ব্লক) হলে শারীরিক পরিশ্রম করার সময় ব্লকে ব্যথা অথবা শ্বাসকষ্ট হয়, যেটাকে অ্যানজাইনা বলে। রক্তনালীর ভেতরে রোগের মাত্রা অধিক হলে অথবা বিশেষ ধরনের ক্ষত সৃষ্টি হলে রক্তনালী সাময়িকভাবে

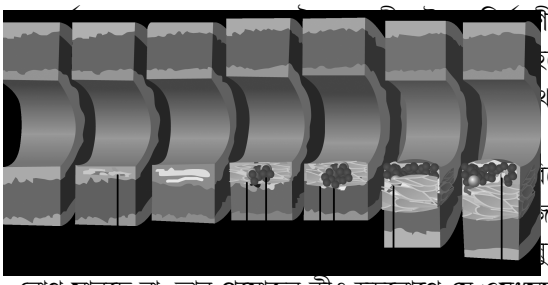

রোগ সারছে না, তার প্রয়োজন কী? হৃদরোগে যে ওষুধসমূহ ব্যবহার হয় সেগুলো প্রধানত দুটো কাজ করে। প্রথমত, রোগজনিত কষ্টের উপশম করে ও কর্মক্ষমতা বাড়ায়। দ্বিতীয়ত, ক্রমবর্ধমান রোগের অগ্রগতিকে শ্লথ করে। এটা জেনে মন খারাপ করার কোনও কারণ নেই। এই ওষুধগুলো এতই কাজের যে প্রাথমিক পর্যায়ে হৃদরোগ নির্ণয় করা গেলে এবং সঠিক ওষুধ,

সঠিক সময় ধরে ব্যবহার করে গেলে প্রায় নীরোগ মানুষের মতো জীবৎকাল নিশ্চিত করা যায়।

প্রয়োজনীয়তার নিরিখে কম কার্যকরী কিন্তু বহু বিতর্কিত বলে বাইপাস অপারেশন এবং অ্যানজিওপ্লাস্টির আলোচনা শেষে করছি। আপাতদৃষ্টিতে হৃদরোগীর সরু হয়ে যাওয়া রক্তনালী বাইপাস অপারেশন অথবা অ্যানজিওপ্লাস্টি করে মেরামত করে দিলে লাভ হতে পারে বলে মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক। এমনটি আশা করে অসংখ্য পরীক্ষানিরীক্ষার পর বৈজ্ঞানিকরা বুঝেছে, এখনও অনেক কিছু বুঝতে বাকি আছে। অন্যান্য প্রয়োগ বিদ্যার

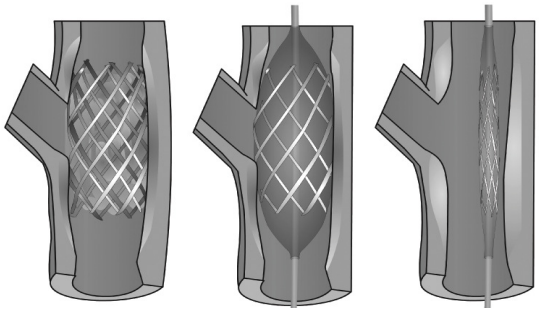

মতো, চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রযুক্তির কর্মক্ষমতা উপলব্ধি করার দুইটি পর্যায় আছে। প্রথমে চাই প্রযুক্তির যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা ও পরিশেষে একাধিক নিরপেক্ষ ও নিয়ন্ত্রিত সমমাত্রার রোগপরিবেশে তার ব্যবহারিক প্রয়োগের সফলতা প্রদর্শন (randomized multi-centric clinical trials)। পূর্বে উল্লেখিত হৃদরোগের কারণটা আবার মনে করা যাক—এটা কোনও আঞ্চলিক রোগ নয়। মনে করুন, পরিচর্যার অভাবে স্নানঘরের অবহেলিত জীর্ণ জলের পাইপ মরচে ধরেছে। আপনার নিজের ভালোবাসার বাসা হলে আপনি কেবল দু'এক স্থানের তাৎক্ষণিক মেরামত করে কী নিশ্চিত হতে পারবেন? স্বভাবতই আপনি সমস্ত পাইপ পাল্টে ফেলে নিয়মমত রক্ষণাবেক্ষণের বন্দোবস্ত করবেন, যাতে এই দুরবস্থার পুনরাবৃত্তি না হয়। এটা একটা কঠোর সত্য যে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাম্প্রতিকতম প্রযুক্তিতেও রোগাক্রান্ত রক্তনালী সমূহ পাল্টে ফেলা সম্ভব নয়। অথবা, এমন কোনও ওষুধ আবিষ্কার করা যায় নি, যেটা দিয়ে রোগাক্রান্ত রক্তনালীগুলোকে সাফসুতরো করে রোগমুক্ত করা যায়। পুনরায় উল্লেখ করি, সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও ওষুধ দিয়ে হৃদরোগের অগ্রগতিকে শ্লথ করা যায় মাত্র। এটা বুঝতে কোনও অসুবিধা হয় না, বাইপাস অপারেশন এবং অ্যানজিওপ্লাস্টি করে কেবলমাত্র একটা তাৎক্ষণিক রোগের উপশম সম্ভব। সমালোচক বিশেষজ্ঞরা অবশ্য আরও একটা কারণে বাইপাস অপারেশন এবং অ্যানজিওপ্লাস্টি পদ্ধতিগুলোর দীর্ঘজীবন প্রদানে সফলতা সম্বন্ধে সন্দিহান। অন্যান্য কারণের সাথে, বিশেষ করে, অ্যানজিওপ্লাস্টি চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগকালে, পদ্ধতিগত কারণে, রক্তনালীর মধ্যে নতুন করে ক্ষত সৃষ্টি হয় এবং সেটা পরবর্তীকালে রোগবৃদ্ধির কারণ হয়। অর্থাৎ যুক্তিগ্রাহ্যভাবে বাইপাস অপারেশন অথবা অ্যানজিওপ্লাস্টি হৃদরোগের নিরাময়ের বা উপশমের হাতিয়ার হতে পারে না।

কেবলমাত্র গুটিকয় বিশেষ ক্ষেত্রে ছাড়া, বিগত দুই দশক ধরে উন্নত থেকে উন্নততর প্রযুক্তি উদ্ভাবন সত্ত্বেও বাইপাস অপারেশন এবং অ্যানজিওপ্লাস্টির অসংখ্য প্রয়োগমূলক পরীক্ষানিরীক্ষা (clinical trials) হৃদরোগে আয়ুষ্কাল বৃদ্ধিতে সফলতা অর্জন করতে পারে নি। পরীক্ষানিরীক্ষা চলতে থাকুক, সেটা চলাটাই নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের প্রথম পদক্ষেপ। কিন্তু অসফল প্রযুক্তির অনিয়ন্ত্রিত এবং যথেচ্ছ ব্যবহার হবে কেন?

কেবলমাত্র ব্যাবসায়িক কারণে, অত্যন্ত ব্যয়বহুল বাইপাস অপারেশন অথবা অ্যানজিওপ্লাস্টির পক্ষে ক্রমাগত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সুকৌশলে জনমানসে একটা ভ্রান্ত ধারণা তৈরি করা হয়েছে, যেটা কোনমতেই যুক্তিনির্ভর অথবা প্রমাণনির্ভর নয়। যেনতেন প্রকারে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রথম সুযোগেই, অপ্রয়োজনীয় অ্যানজিওগ্রাফি নামে পরীক্ষা করে আর অর্ধসত্য তথ্য পরিবেশন করে হৃদরোগীকে খুব সহজে বোঝানো হচ্ছে, হৃদয়ের রক্তনালীতে এক বা একাধিক ব্লক আছে। সুচতুরভাবে চেপে যাওয়া হচ্ছে, গুটিকয় বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া, ঐ ব্লকগুলোর মেরামত করলে রোগীর আখেরে কোনও লাভ হবে না, অথবা, বেশ কিছু ক্ষেত্রে, ব্লকের ব্যথার কারণ সরু হয়ে যাওয়া হৃৎপিণ্ডের রক্তনালী নয়।

যে গুটিকয় বিশেষ ক্ষেত্রে বাইপাসের অপারেশন অথবা অ্যানজিওপ্লাস্টি করলে উৎকৃষ্ট অথবা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘজীবন প্রাপ্তি হয় বলে প্রমাণিত সেটা উল্লেখ করি :

(১) হৃদরোগে আক্রান্ত (হার্ট অ্যাটাক, অ্যাকিউট মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন) হবার পরে প্রথম ২ ঘণ্টার মধ্যে রোগ সৃষ্টিকারি রক্তনালীর ব্লকটির অ্যানজিওপ্লাস্টি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘজীবন প্রদান করে। মনে রাখতে হবে, রক্তনালীর যে কোনও ব্লকই হার্ট অ্যাটাক করে না আর হার্ট অ্যাটাক হবার পর ৬ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলে এই রকম ক্ষেত্রে অ্যানজিওপ্লাস্টি কোনও কাজে আসে না।

(২) একাধিক ব্লক ও মধুমেহ রোগগ্রস্ত (ডায়াবেটিস) রোগীর

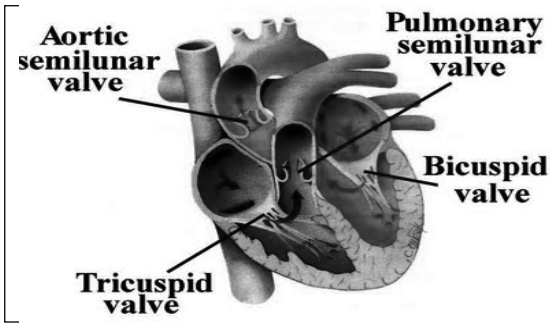

ক্ষেত্রে অ্যানজিওপ্লাস্টি নয়, বাইপাস অপারেশন কোনও কোনও ক্ষেত্রে দীর্ঘ ও উৎকৃষ্ট জীবন প্রদান করে।

(৩) দৈনন্দিনের সাধারণ কায়িক পরিশ্রমজনিত বুকের ব্যথা অথবা শ্বাসকষ্ট ওষুধ দিয়ে কমানো না গেলে বাইপাস অপারেশন অথবা অ্যানজিওপ্লাস্টি উৎকৃষ্ট জীবন প্রদান করে, যদিও দীর্ঘজীবন প্রাপ্তি হয় না। হৃদরোগজনিত বুকের কষ্ট কমানোর ক্ষেত্রে রিভস্কুলারাইজেশনের এই দুটো প্রযুক্তির মধ্যে বাইপাস অপারেশন অথবা অ্যানজিওপ্লাস্টির এই ব্যবহারটা রোগীর বয়স ও কর্মক্ষম হবার প্রয়োজনের উপর নির্ভরশীল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, একজন ৪৫ বৎসর বয়স্ক রোজগেরে মানুষ লাখটাকা খরচ করে কর্মক্ষম হতে পারলে লাভ আছে, যদিও তাকে হয়তো বছর পাঁচেক পরে পুনরায় অ্যানজিওপ্লাস্টি করতে হতে পারে। কিন্তু একজন ৭০ বৎসর বয়স্ক অবসরপ্রাপ্ত রোগীকে অ্যানজিওপ্লস্টির প্রয়োগের আগে সংবেদনশীল মন নিয়ে বোঝাতে হবে, কোনও অর্থমূল্যে সে কী পেতে চলেছে। যেহেতু, এই ধরনের হৃদরোগীর ক্ষেত্রে দীর্ঘজীবন প্রদান করা এখনও পর্যন্ত সম্ভব হচ্ছে না, উপভোক্তা কম খরচের এবং কম কর্মক্ষম জীবন বেছে নিতেই পারে।

এই প্রসঙ্গে এই তথ্যটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাইপাস শল্য চিকিৎসার চেয়ে ওষুধের চিকিৎসাটা খরচের সাপেক্ষে অধিকতর কার্যকরী (কস্ট এফেক্টিভ)। গুটিকয় ক্ষেত্রে রিভাস্কুলারাইজেশনের দুই প্রযুক্তির মধ্যে অ্যানজিওপ্লাস্টি বড় মাপের অর্থমূল্যে অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষ কিন্তু ক্ষণস্থায়ী জীবন দেয় এবং প্রায় ক্ষেত্রে পুনরায় অ্যানজিওপ্লাস্টি করার প্রয়োজন হয়। আবার অন্য প্রযুক্তি হিসাবে বাইপাস শল্য চিকিৎসা উৎকর্ষ এবং দীর্ঘতর জীবন দান করে সমমাপের অর্থমূল্যে। তবে সেটা পাওয়া যায় কিছুটা অনিশ্চয়তা ও বাইপাস অপারেশনের পরের দীর্ঘ রোগভোগ আপস করে নেওয়ার মাধ্যমে।

ধরা যাক, কোনও এক মধ্যবিত্ত ছোট সুখী পরিবারের একমাত্র রোজগেরে সদস্য হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছে। রোগটা দুই ধরনের হতে পারে।

(১) **ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজ:** বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেটা হার্ট অ্যাটাক বা হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়া নয়, বরং ক্রনিক ইস্কিমিক হার্ট ডিজি বা অ্যানজাইনা। এই ক্ষেত্রে অ্যানজিওপ্লাস্টি পরীক্ষা করলে রক্তনালীর উপস্থিতি নির্ণয় করা যেতেই পারে, কিন্তু সেটাকে বাইপাস অপারেশন অথবা অ্যানজিওপ্লাস্টি করলেই যে উপকার হবে সেটা যুক্তি নির্ভর বা প্রমাণ নির্ভর নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুধু ওষুধের চিকিৎসায় একই অথবা তুলনামূলক ভাবে উন্নততর ফল পাওয়া যায়। আরও উন্নততর প্রযুক্তির প্রয়োগ করতে চাইলে, কিছু বিশেষ পরীক্ষানিরীক্ষা (ট্রেডমিল টেস্ট, পারফিউশন স্ক্যান, স্ট্রেস ইকোকার্ডিওগ্রাফি ইত্যাদি) করে বিশেষ কিছু নিদর্শন পাওয়া গেলে অ্যানজিওপ্লাস্টি নয়, বাইপাস অপারেশনে অপেক্ষাকৃত উন্নততর ও দীর্ঘজীবন লাভ করা যায়। ইদানিং কালে অ্যানজিওপ্লাস্টি প্রযুক্তির উন্নতি সাধনের ক্রমাগত নতুন নতুন পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে। সেগুলোর উৎকর্ষতা প্রমাণের অপেক্ষায় আছে এবং অত্যন্ত ব্যয়বহুল।

(২) **হার্ট অ্যাটাক:** রক্তনালীর রোগ সম্পর্কিত হৃদরোগের মধ্যে হার্ট অ্যাটাক বা হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার রোগ অপেক্ষাকৃত ভাবে কম। দুর্ভাগ্যক্রমে, হার্ট অ্যাটাক হবার পর অনেকগুলো ধাপ পেরিয়ে অ্যানজিওপ্লাস্টির অপারেশন টেবিলে পৌঁছতে ৬ ঘণ্টার চেয়েও দেরি হয়ে যায়। তাই, অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাইমারি অ্যানজিওপ্লাস্টি নামে আয়ুষ্কাল বৃদ্ধিকারী প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায় না। হার্ট অ্যাটাক হবার পর ৪ থেকে ৬ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলে অ্যানজিওপ্লাস্টি করা অর্থহীন। সে ক্ষেত্রে আপৎকালীন অবস্থা থিতিয়ে গেলে, পরবর্তীকালে ট্রেডমিল টেস্ট, পারফিউশন স্ক্যান ইত্যাদি করে দেখে নিতে হয় বাইপাস অপারেশন অথবা অ্যানজিওপ্লাস্টি করলে কোনও লাভ হবে কিনা। যেহেতু হার্ট অ্যাটাক বা হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর, ভিন্ন আর্থসামাজিক অবস্থার জন্য, অনেক ক্ষেত্রে আমাদের দেশে খুব তাড়াতাড়ি হাসপাতালে পৌঁছনো সম্ভব হয় না, অথবা পৌঁছনো সম্ভব হলেও বিশেষ করে অসময়ে, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের উপস্থিতি নিশ্চিত করা যায় না, অথবা প্রযুক্তির ব্যয়ভার বহন সম্ভব হয় না। তাই এই রকম অবস্থার জন্য প্রায় সমমানের বিকল্প ওষুধের চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়। সেই সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা আজকের বিষয় নয়।

দুর্ভাগ্যক্রমে হৃদরোগের চিকিৎসা সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড, উদ্যোগ, ব্যয় ও মনোযোগ হার্ট অ্যাটাক বা হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসাকেন্দ্রিক। কোনও হাসপাতালের উৎকর্ষতা সেটার ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটের মান ও উৎকর্ষতার নিরিখে বিচার্য। যদিও কোনও জনগোষ্ঠীর সুস্থ হৃদয় নিশ্চিন্ত করার জন্য ক্রনিক ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজ বা অ্যানজাইনা-কে নিশানা করা উচিত। কারণ, পরিসংখ্যান অনুযায়ী, কোন জনগোষ্ঠীতে প্রতি একজন হার্ট অ্যাটাকের রোগীর চারপাশে আরও ৩০জন ক্রনিক ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজের (অ্যানজাইনা) রোগী হার্ট অ্যাটাকের অপেক্ষায় থাকে আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে হার্ট অ্যাটাক হবার আগে ক্রনিক ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজ তার উপস্থিতি জানিয়ে দেয়। আমরা আগেই জেনেছি, এই শেষোক্ত ধরনের হৃদরোগে বাইপাস অপারেশন অথবা অ্যানজিওপ্লাস্টির ভূমিকা নগণ্য এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিহারযোগ্য। প্রয়োজন শৈশবকাল থেকে সুস্থ জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হওয়া যা হৃদরোগ নিবারণে সফল বলে প্রমাণিত। দুর্ভাগ্যক্রমে যদি সেটা পরিবারের কাউকে আক্রান্ত করে, তার পরবর্তী প্রজন্মের অন্তত এর থেকে শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা নিয়ে

নিজেদেরকে সুরক্ষিত করা উচিত। প্রথম ধাপের প্রতিরক্ষা বলয় যদি বলবৎ করা নাও যায়, হৃদরোগ তার উপস্থিতি জানান দেয়, তবে তার মোকাবিলায় বাইপাস অপারেশন অথবা অ্যানজিওপ্লাস্টি সঠিক হাতিয়ার নয়। সফল চিকিৎসা হল

(১) সুখাদ্য নির্বাচন (স্নেহজাতীয় খাবার ক্যালোরির হিসাবে শতকরা ১০ ভাগের কম, সম্পৃক্ত স্নেহজাতীয় খাবার (স্যাচুরেটেড ফ্যাট) বর্জন আর খাদ্যতালিকায় ভেজানো ছোলা ও ডাল জাতীয় খাবার (legumes), বিভিন্ন মরশুমি ফল ও ফাইবার জাতীয় খাবারের অন্তর্ভুক্তি)। (২) দৈনিক ৩ থেকে ৪ কিলোমিটার হাঁটা। (৩) স্থূলতা কমানো। (৪) তামাকের ব্যবহার পুরোপুরি ভাবে বর্জন করা। (৫) প্রয়োজন বোধে আজীবন ওষুধের ব্যবহার করে রক্তচাপ, মধুমেহ, অতিরিক্ত কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করা। (৬) অ্যাসপিরিন জাতীয় ওষুধ, যা রক্ত জমাট বাঁধতে বাধা দেয়, ব্যবহার করা।

বিগত দুই দশকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নত প্রযুক্তির দ্বারা সারা বিশ্বে হৃদরোগে মৃত্যুর সংখ্যা শতকরা ৪০ ভাগ কমানো গেছে। এর অর্ধেক সুফল এসেছে হৃদরোগের উপাদান, অর্থাৎ উচ্চ রক্তচাপ, মধুমেহ, রক্তে মাত্রাতিরিক্ত কোলেস্টেরল, স্থূলতা, তামাকের ব্যবহার, শারীরিক পরিশ্রম বিমুখতা (কার্ডিয়াক রিস্ক ফ্যাক্টরস) নিবারণ করে। বাকি অর্ধেক সুফল এসেছে হৃদরোগে রোগাক্রান্ত রোগীদের ওষুধের চিকিৎসা ও পূর্বে উল্লিখিত সঠিক প্রয়োজনে বাইপাস অপারেশন অথবা অ্যানজিওপ্লাস্টি করে।

সুস্থ জীবনযাত্রা প্রণালীর উপকারিতা ব্যাপকহারে সমাদৃত হলেও এবং মুহুর্মুহু এর সপক্ষে উপদেশ দেওয়া সত্ত্বেও কোনও এক আশ্চর্য কারণে সুস্থ জীবনযাত্রা প্রণালী প্রয়োগে অনীহা হৃদরোগ নিবারণের পথে এক মস্ত বাধা। এর কারণ দ্বিবিধ। প্রথমত, এর সুফল তাৎক্ষণিক নয় ও দ্বিতীয়ত, এর জন্য প্রয়োজন অভ্যাসের আমূল পরিবর্তন, যেটা টিটেনাস অথবা পোলিওর প্রতিষেধক টিকা নেবার চেয়ে অনেক কঠিন।

বাইপাস অপারেশন অথবা অ্যানজিওপ্লাস্টির মধ্যে তুলনা করতে চাইলে বলতে হয়, হৃদরোগজনিত কষ্ট কমিয়ে উৎকৃষ্ট জীবন প্রদানে অথবা ক্ষেত্র বিশেষে দীর্ঘজীবন প্রদানে বাইপাস অপারেশন অ্যানজিওপ্লাস্টির চেয়ে অধিক সফল। অন্যদিকে, অ্যানজিওপ্লাস্টি প্রযুক্তিটি সরল, অল্প সময়ে সেরে ফেলা যায়, এক বা দুই দিন হাসপাতালে থেকে আবার কাজে লেগে পড়া যায় আর চিকিৎসার পরে বিশেষ কোনও কষ্ট হয় না বলে এটি অধিক জনপ্রিয়। তাই, এই তুলনার কোনও শেষ উত্তর জানা নেই। যদি রিভাস্কুলারাইজেশন করার সিদ্ধান্ত নেওয়াই হয়, কেবল রোগের পর্যায় বা মাত্রা জানলেই হবে না। প্রযুক্তির ফলাফল সম্বন্ধে সচেতন রোগীর পছন্দ, চিকিৎসকের প্রশিক্ষণ, হাসপাতালের পরিষেবা ও আর্থসামাজিক অবস্থা অনুযায়ী বাইপাস অপারেশন অথবা অ্যানজিপ্লাস্টির মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হয়।

এটা স্বীকার করতে লজ্জা হচ্ছে, রিভাস্কুলারাইজেশনের এই দুই প্রযুক্তিতে বেশ কিছুটা অর্থ হাতবদল হয়। সেই অর্থের একটা অংশ হাসপাতাল ও চিকিৎসকের হাতেও পৌঁছে যায় বিনা আয়াসে। চিকিৎসকও যেহেতু এই সমাজের একজন, সেই প্রলোভন ত্যাগ করার মানসিক জোর তাদের অনেকেরই থাকে না। ফলে অবহেলিত হয় ওষুধের চিকিৎসা আর চলতে থাকে বাইপাস অপারেশন আর অ্যানজিওপ্লাস্টির অপপ্রয়োগ। এই কুকর্ম কাণ্ড কেবল বেসরকারি হাসপাতাল নয়, সরকারি হাসপাতালেও ঘটে চলেছে। বাইপাস অপারেশন আর অ্যানজিওপ্লাস্টির প্রয়োজনীয় একবার ব্যবহারযোগ্য জিনিসপত্র এখনও সরকারি হাসপাতাল সরবরাহ করে না। বহুজাগতিক ব্যবসায়ীদের দালাল বা এজেন্টদের দৌরাত্ম্যে উদ্বুদ্ধ চিকিৎসা ব্যবস্থা রিভাস্কুলারাইজেশন প্রয়োগের ফাঁকফোকর খুঁজে বার করতে বিশেষ পারদর্শী। অনেকে বলে থাকেন, অনেক ক্ষেত্রে রোগী ও তার আত্মীয়স্বজন রিভাস্কুলারাইজেন করাতে চাপ সৃষ্টি করে। রোগী ও তার আত্মীয়স্বজনদের ধারণা, বাইপাস অপারেশন অথবা অ্যানজিওপ্লাস্টি না করলে চিকিৎসায় অবহেলা করা হয়। আসলে সেটা সত্যকে এড়িয়ে যাওয়ার সামিল। দুর্ভাগ্যক্রমে এমন হাসপাতাল বা এমন চিকিৎসকের সন্ধান জানা নেই যেখানে গেলে হৃদরোগীরা প্রতারিত হবেন না, তাই কেবল সমালোচনা করেই ক্ষান্ত হতে হচ্ছে।

পরিশেষে উল্লেখ করি, দীর্ঘ ১৩১ বৎসর দাপটের সাথে ব্যবসা করার পর, ১৯শে জানুয়ারি, ২০১২ ইস্টম্যন কোডাক কোম্পানি নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করেছে। কারণ তারা বৈদ্যুতিন বিপ্লবের সাথে তাল রাখতে পারে নি। উপভোক্তার পরিবর্তিত প্রয়োজনকে অবজ্ঞা করেছে। মানুষের ভালো ছবির প্রয়োজন ছিল, ডিজিটাল ক্যামেরা অনেক সহজে তাৎক্ষণিক ছবির বন্দোবস্ত করে দেওয়ায়, মানুষ অ্যানালগ ক্যামেরাকে বর্জন করেছে। কোডাক ব্যবসা হারিয়েছে। এটাই বাজারের চিরাচরিত নিয়ম। মানুষ সুস্বাস্থ্য চায়। বর্তমানের দুর্মূল্য, জটিল, স্বাস্থ্যব্যবস্থা, যা কিনা সামগ্রিক ভাবে কোনও জনগোষ্ঠীর সুস্বাস্থ্যের পথ দেখায় না, তার ভবিষ্যত সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়াটাই স্বাভাবিক। আশা রাখি, ভবিষ্যতের সফল চিকিৎসক, ভাল হাসপাতাল আর সুচিকিৎসা ব্যবস্থা তাদের কর্মকাণ্ড চার দেওয়ালের বাইরে নিয়ে গিয়ে, পরিষেবা নির্ভর না হয়ে উপভোক্তামুখী হবে আর তাদের সফলতার মাপকাঠি হবে ভিন্ন। কত জটিল রোগ উন্নত মানের শল্যচিকিৎসায় মেরামত করা গেল তা অপ্রাসঙ্গিক হবে। অসুস্থ মানুষটিকে কত কম খরচে এবং সহজ ভাবে দীর্ঘ, সুস্থ ও কর্মক্ষম জীবন-উপহার দেওয়া গেল, সর্বোপরি, সামগ্রিক জনগোষ্ঠীকে কত কম আয়াসে সুস্থ রাখা গেল সেটাই হবে সফলতার সঠিক মাপকাঠি।

উমা

চিকিৎসকের উপহার-রোগ

ভবানীপ্রসাদ সাহু

একক মৌরসিপাট্টার দিন গিয়েছে। এখন সবাইকে 'দিয়ে-থুয়ে' খেতে হয়। এটাই যুগধর্ম। তুমি আমায় দেখবে, আমি তোমায় দেখব, ব্যস। এই নিয়মে রাজনীতিক-অপরাধী, জ্যোতিষী-রত্নবিক্রেতা, সংবাদমাধ্যম-কর্পোরেট হাউস —সবাই চলছে। সবচেয়ে বড় 'সমাজবন্ধু', ভগবানের পরেই যার স্থান, সেই ডাক্তাররা আবার নানা সমীকরণে নানা জনের সঙ্গে যুক্ত। ডাক্তার-ওষুধ কোম্পানি, ডাক্তার-প্যাথলজিক্যাল ল্যাব, ডাক্তার-নার্সিংহোম, ডাক্তার-চোখের লেন্স, পেসমেকার ইত্যাদি বিক্রেতা। অতগুলো বিষয় নিয়ে এখানে আলোচনার সুযোগ নেই। এখানে ডাক্তারদের প্রতি ওষুধ কোম্পানির অপার স্নেহই আলোচ্য।

আজ থেকে ৩৫-৩৬ বছর আগে যখন মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাস করে স্টেথো গলায় শিক্ষানবিশি করছি, তখনই দেখেছি আমাদের মতো লেগে পড়েছে মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভরা। বিনে পয়সার ওষুধ-নমুনা তো ছিলই, সঙ্গে লেখার প্যাড, পেন স্ট্যান্ড, তোয়ালে, হ্যাঙার, ক্লিপ, ঝুমঝুমি জাতীয় খেলনা ইত্যাদি দিত উপহার হিসাবে। উপহার পেলে সবারই ভাল লাগে। তাছাড়া এতো আর নগদ টাকা নয় যে ঘুষ বলে ধরা হবে। নেওয়ার পরই আসে কৃতজ্ঞতার প্রশ্ন। অতএব ইন্ডোর এবং আউটডোরে উপহারদাতা কোম্পানির ওষুধ লেখাই চলত। ওষুধ হিসাবে এমন অনেক জিনিসের নামও লিখতে হত যেগুলো নিছক গুড়গোলার মতো আয়রন-ভিটামিন টনিক, হজমের সিরাপ, বাসকপাতার রস দিয়ে কাশির সিরাপ ইত্যাদি।

ছবি:শুভ্রনীল ঘোষ

রবীন্দ্রনাথের একটা ছড়ায় আছে, 'অল্পেতে খুশি হবে দামোদর শেঠ কি ...'। এখনকার ডাক্তাররাও একটা লেখার প্যাড বা পেন স্ট্যান্ডে খুশি হন না। ওগুলো বাড়ি নিয়ে গেলে স্ত্রী হয়ত মুখের ওপরেই ছুঁড়ে মারবেন! তাই এখন উপহার দেওয়া হয় অনেক দামি জিনিস। বিশেষ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে অন্য রাজ্যে বা দেশে কনফারেন্সে যাওয়ার, দামি হোটেলে থাকার খরচাও দেওয়া হয়। চিকিৎসকেরা এগুলো পেয়ে তৃপ্ত বোধ করেন। ভাবেন, এ তাঁদের যোগ্য সমাদর, কৃতবিদ্যতার পুরস্কার। অথচ কয়েক দশক আগেও ব্যাপারটি এমন ছিল না। তখন নানা ওষুধ কোম্পানির মধ্যে এত ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতাও ছিল না, একই ওষুধ নানা ট্রেড নামে চালুও ছিল না এবং সর্বোপরি একই সঙ্গে ছিল না এত ট্যাবলেট ক্যাপসুল ইনজেকশান আর চিকিৎসার জন্য নানা যন্ত্রপাতি রোগীকে দিয়ে কেনানো বা এত দামি পরীক্ষা-নিরীক্ষা। মেডিক্যাল কলেজে আমরা যখন ফার্মাকোলজি পড়ি, তখনো অ্যালকালি মিক্সচার, কাফ মিক্সচার, কার্মিনেটিভ মিক্সচার সহ নানা পুরিয়া আর মিক্সচার বানানো শেখানো হত। কিন্তু বাস্তবত তখন এসবের ব্যবহার দ্রুত হারে কমতে শুরু করেছিল। শুধু হাসপাতালের আউটডোর থেকে তখন এসব মিক্সচার ইত্যাদি দেওয়া হত। কিন্তু তার আগে তথাকথিত অ্যালোপ্যাথি ওষুধ দোকানেও এমন মিক্সচার-পুরিয়া বানানো হত, ডাক্তারের নির্দেশ ক্রমেই। ফলে তখন ঐভাবে ডাক্তারকে উপহার দিয়ে ভুলিয়ে নিজেদের ওষুধের প্রচার করার দরকার হত না। চিকিৎসকদের এইভাবে নিজেদের দালাল বা পরোক্ষ বিক্রেতার ভূমিকায় নামিয়ে দেওয়ার কাজ যখন শুরু হয় নি, তখনকার ঐ এম বি বা এম বি বি এস চিকিৎসকরা ওষুধ কোম্পানির কোনো ব্যবসায়িক স্বার্থ মাথায় না রেখে চিকিৎসা এবং চিকিৎসা-ব্যবসাই করতেন। বহুশত বছর ধরে সাধারণ মানুষ চিকিৎসককে যে 'ভগবান'-এর আসনে বসাতেন, এই কয়েক দশক আগেও সেটিই ছিল সামগ্রিক ছবি।

কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে ছবিটা পাল্টাতে থাকে। সমাজের সর্বস্তরে পুঁজি, মুনাফা ও তার জন্য প্রতিযোগিতা দ্রুত বাড়তে থাকে। চিকিৎসকরাও তার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারেন না। দু'একজন ব্যতিক্রমী (বোকা!)-দের বাদ দিয়ে চিকিৎসকদের বৃহদংশকেও এর শিকার হতে হয়। তখন কীভাবে আরো অর্থোপার্জন করা যায়, বিশেষজ্ঞ ও অতি বিশেষজ্ঞ হয়ে শুধু বিরাট ফি নেওয়া নয়, ফি-এর বাইরেও কীভাবে আরো অতিরিক্ত অর্থ পাওয়া যায়—ঐ মানসিকতাও গ্রাস করে চিকিৎসকদের। ওষুধ কোম্পানির উপহার, ল্যাবরেটরির কমিশনের খামে পোরা চাকা,

পেস মেকার-স্টেন্ট-ডিফিব্রিলেটর বিক্রির কমিশনের নগদ টাকা এবং সেমিনার-কনফারেন্স-বেড়ানোর খরচ ইত্যাদি ইত্যাদির পাশাপাশি বিশেষ নার্সিংহোমে রোগী পাঠানোর কমিশন, বিশেষ বিশেষজ্ঞ সিনিয়র ডাক্তারকে রোগী পাঠানোর জন্য 'স্নেহমাখা' খাম —ইত্যাদি নানাভাবে চিকিৎসা-কর্ম-বহির্ভূত অর্থপ্রাপ্তির সর্বজনবিদিত গোপন আয়ের উৎস খুলে গেছে। বর্তমান সামাজিক পরিবেশে কোনও চিকিৎসকের পক্ষে সাধারণভাবে এ সবের মোহ ও লোভ দূর করা অসম্ভব না হলেও, দুরূহ তো বটেই। বিশেষত এখন যখন প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজে পড়ার জন্য বহু লক্ষ থেকে প্রায় এক কোটি টাকাও বিনিয়োগ করা হচ্ছে, তখন সদ্য গোঁফ গজানো নবীন ডাক্তারি ছাত্রের বা সদ্য যৌবনপ্রাপ্তা ছাত্রীর প্রথম বর্ষ থেকেই লক্ষ্য স্থির হয়ে যায় —কীভাবে ভালোভাবে বা যেভাবেই হোক ডাক্তারি পাস করে ঐ অর্থের বহুগুণ কত কম সময়ে ফেরৎ পাওয়া যায়। হিপোক্রেটিক ওথ বা চিকিৎসকের আদর্শ জাতীয় ব্যাপার এখন উপহাস, উপেক্ষা ও নীরব করুণার বিষয়। তাই কেউ বা কয়েকজন চিকিৎসক যখন ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত রেখে অন্যভাবে চিকিৎসা করেন বা চিকিৎসাকেন্দ্র খোলেন, তখন তা 'খবর' হয়ে ওঠে।

বর্তমানে চিকিৎসকদের কেন্দ্র করে ব্যবসায়ি মহলের, বিশেষত ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম বিক্রেতাদের, নিজেদের মধ্যেকার প্রতিযোগিতা অবাঞ্ছিত বা অসুস্থ হলেও, তাকে এড়ানোর সাধ্য নেই। রাষ্ট্রের সামাজিক ও অর্থনৈতিক আইনি ব্যবস্থাই যখন একই ওষুধের বিভিন্ন (এমনকি কয়েকগুণ) দামে বিভিন্ন ট্রেড নামের অনুমোদন দিয়েছে, তখন ব্যবসায়িক স্বার্থে তাদের প্রতিযোগিতাও রাষ্ট্রীয়ভাবেই অনুমোদিত। আর ব্যবসা রাখতে গিয়ে বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান চিকিৎসকদের মধ্যে নিজেদের পণ্যের প্রচার চালাবে তাও অবধারিত। এই প্রচারের অন্যতম অংশ হচ্ছে নানা উপহার দিয়ে তাদের হাত করা। এই উচ্চহার যখন অত্যন্ত দৃষ্টিকটুভাবে অনেক বেড়ে যায়, তখন অন্যদের চোখে লাগে। কিন্তু প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা যখন সীমাহীন, তখন কে কত উপহার দেবে, তারও লাগাম টানা সম্ভব নয়। ওষুধের দাম যত বেশি হবে, চিকিৎসকদের হাত করার উপহারের মূল্যও স্বাভাবিকভাবে বেশি হবে, যেমন ক্যান্সারের ওষুধের ক্ষেত্রে। ক্যান্সার-ব্যবসা এখন দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যবসা—পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পের পরেই। কেমোথেরাপির জন্য ১৯৯০-এর পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের যে সব ওষুধ ব্যবহৃত হচ্ছে তার দাম অত্যন্ত বেশি এবং স্বাভাবিকভাবেই খুবই লাভজনক। কিন্তু এটিও প্রমাণিত যে এত ব্যয় বহুল চিকিৎসা করেও যতটুকু সুফল পাওয়া যায়, তা বর্ধিত মূল্যের সমানুপাতিক আদৌ নয়, বরং অনেক কম। একমাত্র সুফল পায় ব্যবসায়ি গোষ্ঠী। কিন্তু ক্যান্সারের রোগীর বাড়ির লোকজন ঘটিবাটি বিক্রি করেও এত দামি ওষুধ কেনেন এবং তাঁদের কেনাতে বাধ্য করেন ঐ চিকিৎসকরাই। আর নানা উপহার, নগদ অর্থ বা ভ্রমণের ব্যয় মিটিয়ে নৈতিকভাবে ঐ চিকিৎসকদের তা লিখতে বাধ্য করে ঔষধ ব্যবসায়িরা —আধুনিক বিজ্ঞানের নামে, প্রমাণ-নির্ভর গবেষণার নামে। এবং এই সব গবেষণার সিংহভাগই পরিচালিত হয় বৃহৎ ও বহুজাতিক ঔষধ কোম্পানির অর্থে ও স্বার্থে। ক্যান্সারের ওষুধ একটি উদাহরণ হলেও প্রাণ বাঁচানোর নাম করে হৃদরোগে এলোপাথাড়ি স্টেন্ট বা পেসমেকার জাতীয় দামি যন্ত্রপাতি বা প্রসবের সময় সিজারিয়ান অস্ত্রোপচার জাতীয় অসংখ্য ব্যবস্থাদি তথাকথিত আধুনিক পাশ্চাত্য (অ্যালোপ্যাথি!) চিকিৎসায় ক্রমবর্ধমান হারে ও নির্বিচারে করা হয়েছে।

আর এক্ষেত্রে কয়েক দশক আগে চিকিৎসকদের যে মানবিক ভূমিকা ছিল, তা দ্রুত বিলুপ্ত হয়ে ব্যবসায়িক তথা ব্যবসায়ী গোষ্ঠী বা পুঁজির স্বার্থরক্ষাকারী ভূমিকায় রূপান্তরিত হচ্ছে। এই ব্যবস্থা সমাজের অন্য জন পরিষেবার মানুষদের মতো চিকিৎসকদেরও পুতুলনাচের অদৃশ্য বাজিকরের হাতের পুতুলে পরিণত করছে। এইভাবেই ঐ পুতুলের কলম থেকে সাধারণ বাতের ব্যথায় সরকারি হাসপাতালের আউটডোরে দেখাতে আসা দরিদ্র রোগীর জন্য দামি ব্যথার ওষুধের নিদান লেখা হয়। খাওয়াদাওয়া বা অন্যান্য খরচ কমিয়েও রোগী গভীর বিশ্বাস আর অনেক আশা নিয়ে ৮-১০ টাকা দামের ঐ সব ট্যাবলেট ক্যাপসুল কেনে। সাময়িক আরাম হয়তো পায় কিন্তু বিপদ ঘটে আরো বেশি। অথচ এই সাময়িক আরাম হাসপাতাল থেকে বিনামূল্যে দেওয়া প্যারাসিটামলেও পাওয়া যেত। এই ঘটনা দু-একশ' টাকার ওষুধের থেকে চিকিৎসায় দু'এক লক্ষ টাকার খরচ — সর্বত্রই ঘটে। নানা উপঢৌকনে চিকিৎসকদের প্রভাবিত করে অন্তহীন মুনাফার জন্য লালায়িত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি এটি ঘটায়।

আপাতভাবে প্রায় অনিবার্য, এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে গেলে নিছক চিকিৎসকদের মানবিক ও চিকিৎসাক্ষেত্রে বিজ্ঞানমনস্ক হওয়ার এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নয়, সার্বিকভাবে রোগীরই স্বার্থ দেখার জন্য আবেদন চূড়ান্ত সফল হতে পারে না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রথম শর্ত এটিই। আর চরম সাফল্যের জন্য প্রয়োজন সমগ্র চিকিৎসা পরিষেবা ব্যবস্থার গুণগত পরিবর্তন। যাবতীয় ওষুধ ও চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির দাম ও মান দেশের সর্বত্র একই রাখার রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাই লক্ষ লক্ষ মানুষকে কিছু চিকিৎসকের ও চিকিৎসা ব্যবসায়ীদের হাতে গিনিপিগে পরিণত হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে পারে। কিন্তু তা বলা যত সহজ, করা তার চেয়েও বেশি কঠিন। যতদিন তা না হচ্ছে, ততদিন চিকিৎসকদেরই লোভ নিয়ন্ত্রণ করে, ব্যবসায়ীদের দালালে তথা বিক্রেতায় পরিণত না হয়ে, মানবিক হয়ে ওঠা ছাড়া উপহার-সংস্কৃতির লাগামছাড়া উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। দশচক্রে ভগবান ভূত হন, চিকিৎসক তো নেহাত মানুষ। উমা

‘বেপরোয়া’ বনবিহারী

সমীরকুমার ঘোষ

ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে লেখার রেস্ত শেষ। এর মূল কারণ ওঁরই চরম অসহযোগিতা। নিজের সম্পর্কিত তথ্য এবং নিজের সৃষ্টি— কোনোটির সংরক্ষণ নিয়েই ওঁর কোনো মাথাব্যথা ছিল না। সেকেন্ড হ্যান্ড, থার্ড হ্যান্ড ইনফর্মেশন দিয়ে জোড়াতালি দিয়ে খানিকটা চেষ্টা করা হয়েছে ওঁর পরিচিতি দেওয়ার। বাকি দায়িত্ব ভবিষ্যৎ গবেষকদের। হিমানিশ গোস্বামীর কন্যা হৈমন্তী উত্তরাধিকার সূত্রে বনবিহারীর কিছু লেখাপত্র পেয়েছেন। তা নিয়ে কিছু করতেও চান। আপাতত আমরা ‘বেপরোয়া’ বনবিহারী দিয়ে ইতি টানব।

বাংলা সাহিত্যের দুর্ভাগ্য মাত্র তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে ‘বেপরোয়া’ আর প্রকাশিত হয় নি। আর আপামর বাঙালির দুর্ভাগ্য তারা বর্তমান সময়ে সেই পত্রিকা চোখে দেখার সুযোগ হারিয়েছে। মাত্র তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েই ‘বেপরোয়া’ তখন চারিদিকে প্রবল আলোড়ন ফেলেছিল। সম্প্রতি পুরনো ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকা ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে ‘পৌষ ১৩২৯’ সংখ্যায় ‘সাময়িকী’ কলামে বেপরোয়া-র বেনজির স্তুতি চোখে পড়ল। তৎকালীন কুলীন সাহিত্য পত্রিকা ভারতবর্ষ লিখছে :

আমরা কোনো পত্রিকা সম্বন্ধে ‘ভারতবর্ষে’ বড় একটা আলোচনা করি না; এবার কিন্তু একখানি কাগজের পরিচয় দিব। কাগজখানি দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক বা ত্রৈমাসিক হইলে আমরা কোন কথাই বলিতাম না; কাগজখানি ‘অসাময়িক’ অর্থাৎ যখন সময় বা সুযোগ হইবে, সম্পাদকমণ্ডলী তখনই কাগজখানি ছাপিবেন। তাই আমরা আমাদের এই ‘সাময়িকী’তে পত্রখানির পরিচয় দিতেছি। এই পত্রখানির নাম ‘বেপরোয়া’। সময় সম্বন্ধে বেপরোয়া, মূল্য সম্বন্ধে বেপরোয়া, লেখা সম্বন্ধে বেপরোয়া; এদের কথা —‘উড়িয়ে যাব সমাজ, পাঁজি, পদীপিসীর যুক্তি রে, অট্টহাসের জোর বাতাসের ঘায়’। ভাল কথা। প্রথম সংখ্যায় জন্মদিনের নির্ঘণ্ট দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, এ দলটা সত্যসত্যই বেপরোয়া; অর্থাৎ ২রা অগ্রহায়ণ, অমাবস্যা, ত্র্যহস্পর্শ, শনিবার, বারবেলায় ইহার জন্ম। তা হোক, তবুও আমরা এই ‘অসাময়িক’ সহযোগীকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি।

এটুকু লেখার পর সমাপ্তিসূচক রেখা টেনেও পরের পরিচ্ছদে লেখা হয়েছে—

‘শুধু এইটুকু বলিয়াই ‘বেপরোয়া’কে ছাড়িতে পারিতেছি না। ইহার ‘প্রকাশকের নিবেদন’টী আদ্যন্ত উদ্ধৃত করা আজকালকার দিনে বিশেষ প্রয়োজন মনে করিতেছি। আমাদের পাঠক-পাঠিকা এবং সুশীল সহযোগিগণ এই ‘নিবেদনে’ অবহিত হইবেন বলিয়া আশা করিতে পারি কি? ‘নিবেদন’টি এই —“(১) বেপরোয়া বাহির হইল, —কপালের লিখন! (২) এখন হইতে ইহা নিয়মিত বাহির হইতে থাকিবে। তবে কতদিন পরে পরে, বলা কঠিন। (৩) অগ্রিম বার্ষিক মূল্য চাহিব না, কারণ চাহিলে পাইব না। (৪) প্রতি সংখ্যার মূল্য তিন আনা হইতে কুড়ি টাকা। অধিক দিতে আসিলে আপত্তি করিব। (৫) লেখকগণ যত ইচ্ছা লেখা পাঠাইতে পারেন। কোনোটী অমনোনীত হইলে ফেরৎ যাইবে না, —ছাপা হউক আর না হউক! লেখার সঙ্গে বেশী পরিমাণে ডাক-টিকিট আসিলে সুখী হইব। এইগুলিই আমাদের ভরসা। (৬) আমরা পরচর্চ্চা করিব। তবে বিশেষ বেগতিক দেখিলে apology চাহিতেও পশ্চাৎপদ হইব না। (৭) আমরা বেপরোয়া। ত্রিসংসারে কাহারও পরোয়া করিব না। তবে একটী জায়গায় পরোয়া রাখিলাম। কারণ সেখান হইতে যে পরোয়া**না**। প্রাপ্তিস্থান —আপাততঃ ১নং কালু ঘোষের লেন; কিছুদিন পরে ছিন্নাবস্থায়,—মুদীর দোকান, শিশিবোতল-ওয়ালার থলি, টিটাগড় পেপার মিল্‌স্ ও ডাষ্টবিন্।”

‘বেপরোয়া’র অধিক পরিচয়ের প্রয়োজন আছে কি?

বেপরোয়া-য় প্রকাশিত লেখার বেশিরভাগই লিখেছেন বনবিহারী। তবে নাম না থাকায় কোনটা তাঁর তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেও পারে। তার মধ্যে কিছু কিছু লেখা, তাঁর এবং তাঁর লেখার সঙ্গে পরিচিতজনেরা চিহ্নিত করেছেন। বনবিহারী নিজের লেখার সঙ্গে ব্যঙ্গচিত্র আঁকতেন, সেটাও ছিল আরেক উপায়। বেপরোয়া-র

লেখাগুলো পুরোটা ছাপানো গেলেই সবচেয়ে ভাল হত, স্থানাভাবে কিছু কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি, যাতে পাঠকেরা তাঁর লেখার ধার, ভাবনা আর তার প্রকাশভঙ্গির কিছুটা আঁচ পান। পৌষ, ১৩২৯-এ দ্বিতীয় সংখ্যায় লিখেছিলেন 'শিশুর কথা'। লেখাটা শুরু হয়েছে এইভাবে —

'তোমাদের জগতে আমি প্রথম যেদিন এলুম, সেদিনকার কথা আমার বেশ মনে আছে। হঠাৎ একদিন দেখলুম আমি আছে। সত্তার আনন্দে আমার মনপ্রাণ ভরে উঠলো, হাত পা ছুঁড়লুম, দেখলুম আমি মাতৃকুক্ষির অন্ধকারে একটি বোঁটায় ঝুলছি।

মাতার হৃৎপিণ্ডনাড়ির সঙ্গে আমার অন্তরের যোগ ছিল। তাঁর মনের কথা সব টের পেতুম। আমার আবির্ভাবে তিনি হয়ত খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটাও প্রায় তাঁর মনে আসতো যে যদি কোনো উপায়ে আমি ঐ অবস্থাতেই শেষ হই ত তিনি বাঁচেন। আর একজন ছিলেন, এ বিষয়ে যাঁর আগ্রহ ঢের বেশি ছিল। তিনি গাড়ি বাড়ির ব্যবস্থা করতেও রাজি ছিলেন, মার কিন্তু ততটা সাহস হয় নি। আমার এই দ্বিতীয় শুভানুধ্যায়ীটি আমার পিতা, জন্মদাতা। আমাকে সংসারে এনেছেন বলে যাঁর একটা দৃপ্ত কর্তৃত্ববোধ আছে, এবং যিনি এই জন্মদানের প্রতিদান স্বরূপ আমার দেহমনকে আমরণ কিনে রাখতে চান। পিতামাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কিন্তু বেড়ে চললুম, এবং একদিন তোমাদের এই ঠাণ্ডা স্যাঁতস্যোঁতে পৃথিবীতে পদার্পণ ক'রে আঁৎকে উঠলুম। আসবার সময়ে মাকে বড় কষ্ট দিয়েছিলুম। সেজন্য অনুতাপ হয়। এত কষ্ট যে দেবে তার মৃত্যুকামনা করলে দোষ হয় না। তবে মা এমনি ভাবটা দেখান যেন আমাকে পাবার জন্য তিনি স্বেচ্ছায় এ কৃচ্ছ্রসাধন করেছিলেন। এটা ভালো বুঝলুম না। ...

স্নেহ যে পাই নি তা বল্‌চি না। অনেক পেয়েছি। এত না পেলেও চল্‌তো! মা আমাকে পুতুলের মতো ভালোবাসতেন, কথায় কথায় আদরে, চুম্বনে অধীর ক'রে দিতেন। এসব কিন্তু যতক্ষণ পুতুলের মতো থাক্‌তুম, যতক্ষণ তাঁর অমনোমতো কিছু না করতুম, তাঁর অসুবিধে না ঘটাতুম। কিন্তু হায়, আমি যে পুতুল নই। মা যখন তাড়াতাড়ি আমাকে খাইয়ে আপদ চোকাতে চাইতেন তখন হয়ত আমার মোটেই ইচ্ছা থাক্‌তো না, আবার যখন তিনি ঘুমুতেন বা তাস খেলতেন তখন হয়ত ক্ষুধার উদয় হতো। তিনি যখন বেড়াতে যাবেন বলে আমাকে ভালো পোশাক পরিয়ে দিতেন তখন হয়ত খানিকটা ভুষি মেখে তাঁর সব চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে দিতুম। আমার এই সব বেহিসাবী কাজে তিনি ভারি চটতেন। একবার, তখন আমার বয়স মাস ছয়ের হবে, অস্থানে একটা কুকর্ম করেছিলুম বলে মা আমার পিঠে পাঁচটি চড় মারেন, এত জোরে মেরেছিলেন যে পেটে ব্যথা হয়ে গিছ্‌লো। আমি ব্যথায় কাতর হয়ে ঐ মাকেই জড়িয়ে ধরেছিলুম, জানতুম না যে আঘাতটা ঐখান থেকেই আস্‌চে। ...

হলুদবাটায় হাত দিয়েছিলুম বলে মা মাথাটা ঠুকে দিয়ে জানালেন অমন কাজ করতে নেই; চেয়ারে নিশ্চল হয়ে বসে থাকিনি বলে বাবা কান মলে বুঝিয়ে দিলেন যে হাত পা নাড়া পাপ; ঘাটে পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলুম বলে মামা পিঠে চড় মেরে বোঝালেন যে পড়ে যাওয়া দোষের; আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক পায়ে দাঁড় করিয়ে রেখে গুরুমশাই শেখালেন 'আ' নয়, 'স্বরে আ'।

খাবারের পয়সা থেকে লাট্টু কিনিছিলুম বলে জ্যাঠামশাই প্রহার করলেন, লাট্টু তুলে রেখেছিলুম বলে বাবা প্রহার করলেন, লাট্টু ফেলে দিয়েছিলুম বলে কাকা প্রহার করলেন, আর লাট্টু কিনিচি বলে দাদা প্রহার করলেন। আমি কি করি?

বাবার ইচ্ছা আমি সত্যপ্রিয়, জিতেন্দ্রিয়, দাগাবাজ তৈরি হই! কখনও সিগারেট বা মিথ্যাকথা মুখে না আনি, ৫০ টাকার জিনিস থেকে লোক ঠকিয়ে পাঁচলাখ টাকা রোজগার করি, আর সাহেবসুবোদের মনোরঞ্জন করতে একটু আধটু হুইস্কি, সিগার, মাঝে মাঝে খাই।

মার ইচ্ছা ছিল আমি যাই হই না কেন তাঁর যেন কোনো অসুবিধে না ঘটাই; দরকার হলে সত্য কথা বলি, দরকার হলে মিথ্যা কথা বলতেও আপত্তি না করি, হুকুম পাবামাত্র তাঁর মনের মতো পাত্রীটিকে বিবাহ করি, এবং পরদিন গয়নাগুলো কেড়ে নিয়ে তাকে বাপের বাড়ি তুলে দিয়ে এসে রোজগারের সমস্ত টাকাটা তাঁর পায়ে ঢালি এবং ইহকাল পরকাল নষ্ট ক'রে কেবল তাঁর আঁচল ধরে জীবনটা কাটাই। ...

তোমরা বুড়াবয়সে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে গড়গড়া টানতে টানতে বল "সংসার বিষময়"। এটা হল তোমাদের সখের কথা, হাই

তোলবার সময়কার "নারায়ণ" শব্দের মতো, নিরর্থক। সংসার যদি কারুর কাছে বিষময় হয়ে থাকে ত সে আমাদের।'

লেখাটির শেষ পরিচ্ছেদটি হল —'তোমরা বলে যাবে কেন? পৃথিবী তোমাদের, তোমরা তা ভোগ কর। শাস্ত্রটা একটু উল্টে, বনবাসের ব্যবস্থা কর শিশুদের জন্য।'

আবার বলছি, পুরো লেখাটি উদ্ধৃত করতে পারলেই সবচেয়ে ভাল হত। সম্ভব হল না। উদ্ধৃত অংশটুকু হিমশৈলের উপরে ভাসমান অংশটুকু মাত্র। দশক দুয়েক আগে 'উৎস মানুষ' পত্রিকায় পণ্ডিত প্রবর অশোক রুদ্র বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। যার কয়েকটি 'শিকলভাঙা সংস্কৃতি' বইতে সঙ্কলিতও হয়েছে। তারই একটি ছিল 'পিতামাতার প্রতি কর্তব্য' শীর্ষক একটি লেখা। লেখাটিতে লেখক বেশ কিছু অপ্রিয় প্রশ্ন তুলেছিলেন। তা নিয়ে পত্রিকায় বহু চিঠিচাপাটি চালাচালি হয়েছিল। অশোক রুদ্রের অনেক আগে ডাক্তার বনবিহারী মুখুজ্জে 'শিশুর কথা'র মাধ্যমে যে তোপ দেগেছিলেন, তা আমাদের অজানাই থেকে গিয়েছে।

'বাঁকুড়ায় দুটি হিন্দু বালিকাকে কুষ্ঠরোগীর সঙ্গে বিয়ে দেওয়াতে তারা আত্মহত্যা করে।' এই সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল প্রবাসী পত্রিকায়। বেপরোয়া, ১৩২৯, ইংরাজি ১৯২৩, তৃতীয় সংখ্যায় মেয়েদের অসহায়তার কাহিনী নির্মম ব্যঙ্গের ভিতর দিয়ে ফুটিয়ে তোলেন বনবিহারী। একটু গল্পের আকারে লেখা সেই পদ্যটির নাম দিয়েছিলেন 'কলির ফের'। কবিতার বিষয় এই —এক মেয়ে নাকখসা কুষ্ঠরোগীর সঙ্গে বিয়ে হবে শুনে আপত্তি করেছিল, তাতে মেয়ের বাবা তার উপর চটে গিয়ে বলল —

নাক নিয়ে কি ধুয়ে খাবে?
কর্তা বললেনও চটে।
শালগ্রাম যে দেবতা, তার ত
নাক নেই ক মোটে।

বিয়ে ঠেকানো গেল না। কিন্তু মেয়ে স্বামীর ঘরে থাকতে অস্বীকার করল, তখন পিসি-মাসিরা এসে বোঝাতে লাগল —

পতিই হলেন দেব্‌তা
নারীর পরম তীর্থ, পতি
পতির পূজাই শ্রেষ্ঠ পূজা,
পতিই নারীর গতি।

এ সব আপ্ত বাক্যে কাজ হয় না। মেয়ে জানায়—
"স্বামীর গৃহে যাবার আগে"।
কেঁদে বলেন ক'নে,
"যমের বাড়ি ঘুরে আসবার
ইচ্ছা আছে মনে।"

সবাই যমের বাড়ির ভয়াবহতার কথা বলে। তপ্ত তেলে ভাজা বা জাঁতায় পেষার ভয় দেখায়, তাতেও কাজ হয় না।

কলিকালের মেয়ে কিনা, বেজায় একগুঁয়ে!
যমের বাড়ীই গেল, কারুর বক্তৃতায় না নুয়ে।

শেষে বলা হচ্ছে —

কুঠে স্বামী চড়িয়ে কাঁধে, যে দেশের সতী
বেশ্যাবাড়ী পৌঁছে দিত, সে দেশে সম্প্রতি
কি সব কাণ্ড হচ্চে? একটা একরত্তি মেয়ে,
পতির গালে ঠোনা মেরে পালিয়ে এল ধেয়ে!
ব্যাপারটা যে সঙীন তাতে রাখবেন না কেউ সন্দ,
এরির ওপর নির্ভর করচে দেশের ভালো মন্দ।
আমরা, অর্থাৎ পতিরা যদি হই-ই অতি কুৎসিত,
কিংবা গায়ে পচা গন্ধ থাকেই যদি কিঞ্চিৎ,
গাঁজা গুলি টানিই যদি, কিংবা করি চুরি,
কিংবা যদি কারুর বুকে বসাই জোরে ছুরি,
রাতই যদি কাটাই বাইরে নিয়ে পাঁচটি এয়ার,
তা বলে কি স্ত্রীরা মোদের করবেন ডোন্টোকেয়ার?
নাঃ এর একটা বিহিত কর সবাই এক জোটে,
স্ত্রীদের এত বাড়তে দেওয়া সঙ্গত নয় মোটে।
তাঁদের বাড়ে দেশের, অর্থাৎ মোদের, সর্বনাশ
দেশের লাগি তাঁদের মুখে বাগিয়ে ধর রূপ।'

কবিতাটির শেষে ছিল, 'সম্পাদকের মন্তব্য —"কলির ফের" কবিতাটি অমনোনীত হইয়াছিল, বীভৎস-রসাত্মক বলিয়া। কিন্তু

লেখক বলেন, যে দেশে কুষ্ঠরোগী বিবাহ করে এবং পিতা কুষ্ঠরোগীর সঙ্গে বিবাহ দেন সে দেশে বীভৎস ছাড়া অন্য রসের অস্তিত্ব কল্পনা যিনি করেন, তাঁহার রসবোধ নাই।'

সব পত্রপত্রিকাই দুর্গাপুজোর সময় পূজা সংখ্যা বা শারদ সংখ্যা প্রকাশ করে। বেপরোয়া তাদের পূজা সংখ্যা প্রকাশ করেছিল চৈত্র মাসে। ১৩২৯-এর এই তৃতীয় সংখ্যাটিই ছিল শেষ সংখ্যা। এটি উৎসর্গ করা হয়েছিল দেবাদিদেব ঘেঁটু ঠাকুরের উদ্দেশে। তাকে 'আবাহন' জানানো হয়েছিল এইভাবে —

'হে দেবাদিদেব, হে ঘেঁটো, একবার আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হও, আমরা তোমার আবাহন করি। তুমি মহান, তুমি শক্তিমান, আমরা তোমাকে নমস্কার করি। তোমার চরণস্পর্শে বঙ্গদেশ আজ নবশোভা ধারণ করিয়াছে। আজ বসন্ত তাহার শাখা পল্লবে, বসন্ত তাহার ঘরে ঘরে। আজ শীতলার আর বিরাম নাই। তোমারই বা বিরাম কোথায়? শীতলার তবু একটা গাধা আছে, তোমার তাহাও নাই, —quack বলিয়া আজও গাধা কিনিতে পার নাই। ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইও না। এদেশের হাতুড়ের দর কম কিন্তু কদর বেশি।

তুমি পুরুষ কি নারী ঠিক করা শক্ত। বোধ হয় তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতি বড় বেশি হইয়াছে। আমরাও আধ্যাত্মিক, তাই বাহিরের লোকে আমাদের পুরুষ বলিয়া চিনিতে পারে না। এত আধ্যাত্মিক বলিয়াই কি তুমি হাঁড়িমুখো? তবে, হে আধ্যাত্মিক, হে হাঁড়িমুখো, তোমাকে নমস্কার করি।...

গ্রামের মধ্যে তোমার স্থান হইবে না ত কোথায় হইবে? কে না জানে যে দেবতারা হোমিওপ্যাথিক ঔষধের মতো, the higher the dilution, the greater the potency. যাহারা ঈশ্বরের নামও করে না, তাহারা বাবাঠাকুরের পূজা করে। অন্নপূর্ণা অপেক্ষা মনসার আদর বেশি। তবে তোমার আদর হইবে না কেন?'

শুধু 'বেপরোয়া' নয় বনবিহারীর অমূল্য সৃষ্টি ছড়িয়ে আছে 'ভারতবর্ষ', 'শনিবারের চিঠি' ইত্যাদি পত্রিকায়। ভারতবর্ষ পত্রিকায় ব্যঙ্গচিত্রসহ বঙ্গজীবনবৈচিত্র্য তাবলো পদ্ধতিতে প্রকাশ করেছিলেন। তার একটি ছিল 'কেরানী'। এটি দিয়েই আপাতত আমাদের বনবিহারী-সফর শেষ বা শুরু হবে।

লোলচর্ম অস্থিসার জীর্ণবেশ রুক্ষ কেশ কেরানীর ছবির নীচে বনবিহারী লিখেছিলেন —

'চাকরি গেল, চাকরি গেল,
চাকরি রাখা বিষম দায়
ঐ গো বুঝি ন'টা বাজে,
ঐ গো বুঝি চাকরি যায়!
বিজলি-বাতির ফানুস হেন
ঠুন্‌কো মোদের চাকরি ভাই!
ফট করে সে ফাটে, কিন্তু
ফাটার শব্দে চমকে যাই।'

মুজতবা আলী লিখছেন, 'সব শেষে কেরানী যেন বৈদ্যগুরু, কবিরাজ, ডাক্তার মহামান্য শ্রীযুত বনবিহারী মুখোপাধ্যায়কেই ব্যঙ্গ করে বলছে (উইথ এ টুইস্টেড আইরিশ স্মাইল) —

'ভরা পেটে ছুটতে মানা? চিবিয়ে খাওয়া স্বাস্থ্যকর?
চাকরি আগে বাঁচাই দাদা, প্রাণ বাঁচানো সে তারপর।'

পুনশ্চ : বেপরোয়া-র প্রথম সংখ্যার প্রথমেই একটি কবিতা ছাপা হয়েছিল, যার মাধ্যমেই ফুটে উঠেছিল প্রকাশকদের বক্তব্য। কবিতাটি ছিল এরকম —

আজকে পথে বাহির হ'লাম
বেপরোয়া,
অলক্ষণে লক্ষ্য রেখে অক্ষণেতে আজকে মোদের
যাত্রা নোয়া,
বেপরোয়া।
খালির গদা শত্রু ওঁচায়
নেই পরোয়া!
নিষেধ বাণে মিত্র খোঁচায়
নেই পরোয়া!...
চলতে হবে পথ বিপথে, দিন দুপুরে, ভর্‌রাতে,
এগিয়ে চলায় নেশায় র'ব রঙীন।
টলব নাক' বিসর্গ আর অনুস্বারের ছর্‌রাতে
কিংবা দেখে' টিকির খাড়া
সঙীন।
উড়িয়ে যাব সমাজ, পাঁজি, পদি পিসীর যুক্তিরে
অট্টহাসের জোর বাতাসের ঘা'য়
তোরা আয়,
পথের সাথী আছিস্, কে কোথায়?...

বলা বাহুল্য বোতাম আঁটা জামার নীচে শান্তিতে শয়ান প্রাণ আমরা 'বেপরোয়া' হয়ে উঠতে পারিনি। নখদন্তবিহীন চাকুরি অধীন বাঙালি বাবুই থেকে গিয়েছি। খানিকটা 'বেপরোয়া' ভঙ্গিতে পরে আমরা দীপ্তেন সান্যালের 'অচলপত্র'কে পেয়েছে। যদিও বেপরোয়া ও বনবিহারী ধর্মীয় বিশ্বাস, লোকাচার, কুসংস্কার, নারীর প্রতি অবিচার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তীব্র আঘাত হেনেছেন যে সাহস ও প্রত্যয়ের সঙ্গে, তা অচলপত্রে দেখা যায় না। 'উৎস মানুষ' তার সীমিত সামর্থ্য নিয়ে কয়েক দশক একটা 'বেপরোয়া' চেষ্টা চালাচ্ছে। আমাদের ছোট্ট এই প্রদীপটিতে তেলের জোগান দিচ্ছেন 'অগ্নীশ্বর' বনবিহারীর মতো অগ্রজরাই। তাঁকে প্রণাম।

দুষ্প্রাপ্য 'বেপরোয়া' পত্রিকাগুলি পেয়েছি বন্ধুবর সৌম্যেন পালের সৌজন্যে।

কানোরিয়া— সংগ্রাম চলছে

মুখবন্ধ ও অনুলিখন : শীলা চক্রবর্তী

বাংলার অসংখ্য চটকলের একটির নাম 'কানোরিয়া জুট মিল'। রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিল্প চটশিল্প বরাবরই উপেক্ষিত। এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকেরা যেমন শোষিত-বঞ্চিত, তেমনই অনিশ্চয়তা এঁদের নিত্য সঙ্গী। কানোরিয়া জুট মিলও তার ব্যতিক্রম ছিল না। কিন্তু সময়ের ঝুঁটিটাকে শক্ত মুঠোয় ধরে ফেলেন এখানকার শ্রমিকেরা। এক ইতিহাস গড়ে ফেলে কানোরিয়া জুট মিল।

কিছুদিন আগে অবশ্য ভদ্রেশ্বরের ভিক্টোরিয়া জুট মিলে বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠেছিল। কিন্তু দিশাহীনতায় তা অচিরেই নিভে যায়। কানোরিয়ার শ্রমিক আন্দোলন বেগবতী নদীর মতো জনজীবনে ঢেউ তুলল সম্মান ও অধিকার নিয়ে বাঁচার আকাঙ্ক্ষায় আকুল মানুষের মনে! এই রাজ্যে এই দেশে এমনকি দেশের বাইরেও মানুষের বাঁচার আকাঙ্ক্ষা ভাষা পেল। একথা কে না জানে, এই বঙ্গে দশকোটি জনসংখ্যার আড়াই কোটি মানুষের রুটি রুজির প্রশ্ন যুক্ত চটশিল্পের সঙ্গে। অথচ শ্রমনিবিড় এই 'জাতীয়' শিল্পটি এক শ্রেণীর শিল্পবিমুখ ফোড়ে ফাটকাবাজদের খপ্পরে পড়ে ক্রমেই মুমূর্ষু হয়ে পড়ছে। সরকার-প্রশাসনও তেমন মনোযোগী নয়। প্রশাসনের দুর্নীতিগ্রস্ত অংশ বরং মদত দিচ্ছে ঐ ফাটকাবাজদেরই, চটশিল্প দুর্বল থেকে দুর্বলতম হয়েছে। ঐসব শিল্প চালানেওয়ালারা শিল্প আইনের ধার ধারে না। কাঁচামালের জোগান নেই, যন্ত্রপাতি অকেজো, শ্রমিকদের থেকে কাটা পি এফ, ই এস আই জমা করে না, ইচ্ছে মতো 'ভাউচারে' মজুরি খাটায়, শিল্প বিকাশের জন্য কোনো মাথা ব্যথাই তাদের নেই। অথচ কৃষিনির্ভর এই শিল্প আজও পারে দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে, পারে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে। চটশিল্পের শ্রমিক কি এত কিছু বোঝে? হ্যাঁ, বোঝে। বঞ্চনার ভাষা শ্রমিকের থেকে বেশি কে বোঝে! তারা নেতাদের বেইমানি বোঝে, মালিকি জুলুম বোঝে, প্রতিবাদের ভাষা জানে, বোঝে জোটবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা। শিল্প বাঁচাতে, নিজেদের রুটি রুজির অধিকার পেতে অসীম সাহসী তারা। মর্যাদা ও অধিকার অর্জনের কঠিন লড়াইয়ের নামই কানোরিয়া জুট সংগ্রামী শ্রমিক আন্দোলন।

শ্রমিক লড়াই করতে মাথা তুললে মালিক চায় তাকে হাতে আর ভাতে মারার সব কৌশল প্রয়োগ করতে। শ্রমিকদের প্রতি বিশ্বাসঘাতক নেতৃত্বকে তারা প্রথমেই কিনে নেয়। লড়াইটাকে লম্বা করে শ্রমিকদের বেদম করে ফেলতে চায়। সর্ষের মধ্যে ভূত ঢুকিয়ে অর্থাৎ শ্রমিকদেরই একটা অংশকে বেইমান বানানোর চেষ্টা চালায়। আরও নানা ধরনের অপচেষ্টাই কানোরিয়া আন্দোলনের গায়ে আঁচড় কেটেছে, কেটে চলেছে আজও। তাতে কি কানোরিয়া আন্দোলন দমে গেছে? সংগ্রামী শ্রমিক ভয় পেয়েছে? ভয় তারা পায় নি বলেই বর্তমান সরকারের শ্রমমন্ত্রীকে নিজেকে আসতে হয়েছে পাসারির হাত ধরে, সাড়ে পাঁচ বছর বন্ধ মিলটা খুলে দিতে।

যদিও এক বছর পেরিয়ে গেছে আজও কাজ পেল না অর্ধেক কর্মক্ষম শ্রমিক। মিলল না অবসরপ্রাপ্তদের পাওনা, পুরোদমে উৎপাদন হওয়া তো দূরের কথা —কারখানা ঘিরে চলেছে জুলুম, হুমকি আর স্বৈরাচার। এদিকে জুলুম অত্যাচারের জবাবে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে শ্রমিক — যাচ্ছে প্রতিটি শ্রমিকের কাছে, তাদের কাছে টানতে। মানুষের সমর্থনের জন্য আবেদন রাখছে তারা। চলছে আইনের লড়াই, চলছে ময়দানি লড়াইয়ের প্রস্তুতি। লড়াইটা অসম কিনা! বিশ বছর ব্যাপী শ্রমিক আন্দোলন, তাকে দুর্বল করার জন্য কি না করছে মালিক আর তার পোষ্যরা —মেকি শ্রমিক-দরদীদের দিয়ে তারা অপপ্রচার চালাচ্ছে যে 'কানোরিয়া আন্দোলন শেষ হয়ে গেছে'। এত বাধা বিপত্তির মধ্যেও বেশির ভাগ শ্রমিকের লড়াকু মেজাজ আজও টানটান। টাল খাচ্ছে আবার উঠে দাঁড়াচ্ছে। নিজেদের জোট শক্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে পূর্ণোদ্যমে। শিল্প বাঁচানোর বিকল্প পথে হাঁটতে তারা আজও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সময় লাগছে, সময় লাগলেও জয় নিশ্চিত জেনেই এগোচ্ছে তারা।

এই সুদীর্ঘ সংগ্রামে লড়াকু শ্রমিকদের একান্ত ঘনিষ্ঠ তাদের পরিবারের মা-বোনেরা। মা-বোনের সহৃদয় সমর্থন ছাড়া এ লড়াই এগোতে পারে না। লড়াইয়ের রাস্তায় অবিচল থাকা শ্রমিক পরিবারের দু-একজন মা-বোনের জবানিতে আন্দোলনের অতীত থেকে বর্তমান বুঝতে চেষ্টা করা যাক :—

কানোরিয়া জুটের সংগ্রামী শ্রমিক সন্ন্যাসী দাসের স্ত্রী গৌরী দাস বলছেন

শ্রমিকেরা যখন প্রথম রেললাইনে বসল তাদের পাওনাগণ্ডা কিছুই পাচ্ছে না বলে —তোমরা তখন কোথায়? সেই অবরোধে (১৯৯২) আমি গেছি, জানো? ছেলেমেয়েরা সব ছোট ছোট। তাদের জন্য দুটি ভাতেভাত ফুটিয়ে রেখে ছুটে গেছি। খাব কী?

ছেলেমেয়েদের মুখে কী তুলে দেব? কী করে লেখাপড়া শেখাব ওদের? তারপর যখন দালালদের বাদ দিয়ে সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়ন তৈরি হল, প্রফুল্লদা এলেন, তোমরা এলে ... কত মানুষ! কোথা থেকে কে আসছে জানি না। এসব দেখে আমি যাব না! প্রতিটি মিটিংয়ে যাই, মিছিলে যাই। খুব দুঃখ পেয়েছি, তাও গেছি। তিরেনব্বই সালে যখন পথ (বম্বে রোড) অবরোধ হল পুলিশের লাঠির বারি খেলাম ... অ্যায় দ্যাখো। (বাঁ পায়ের ক্ষতচিহ্ন দেখায়)। মানে যাবই যাব। শুধু কি আমি? বাসুদেবের বৌকে মারল, আরতি মার খেল। আমার মেয়েটাকে নিয়ে গেল সহযোগী দিদিরা, বলল ও লড়াইয়ে কাজ করবে। আমি বাধা দিইনি। জানো, আমার পোষা কুকুরটাকে কে যেন মেরে ছিল। কেন দেব? আমার স্বামীর কারখানা, না লড়লে খুলবে? নিজেরা খেতে পাব? বরং বলিচি, অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে সবাইকে যেতে হবে। মিল চালু থাকলে আরো অনেক লোকের উপকার।

চুরুনব্বইয়ের পর দেখি আন্দোলন থেকে কেউ কেউ কাট্‌কে যাচ্ছে। কেন? মানুষ কি হতাশ হল? লড়াই ছেড়ে যাচ্ছে কেন? মনে খুব প্রশ্ন জাগত। এত বড় লড়াই, এমন হচ্ছে কেন! ভাল লাগত না।

এখন ভাল ভাবেই বুঝি দালালগুলো ভেগেছে। আন্দোলন কারো একার কাজ? সবাইকে আসতে হবে। কারখানার ভালো মানে আমাদের ভালো। ঝিমিয়ে গেলে হবে না। আন্দোলন ঠিকই চলছে। শ্রমমন্ত্রী পাসারিকে দিয়ে মিল খোলাল। কী হল? সবাই কাজ পেল? রিটায়ার্ড লোকেরা পয়সা পেল? দমে গেলে হবে না। ময়দানে আবার নামতে হবে। নইলে উপায় নেই। আমাদের লড়াই আমরা ছাড়া কে লড়বে বলো? মানুষের সাহায্য নিয়ে পাসারিকে দূর করবই, দেখো।

লড়াকু শ্রমিক তপন মালিকের মা
সীতা মালিক কি বলছেন

মিলটা বন্ধ হল — সবাই ডাকল, বলল 'রেলরোকো' হবে —চলো। গেলাম। অন্যদের ডাকতে ডাকতেই গেলাম। আমার বড়-মেজো দুটো ছেলেই যে ঐ কারখানায় খাটে। কি বয়স ওদের? মিল বন্ধ থাকলে খাব কী? অবরোধ করতে গিয়ে পুলিশের মার খেলাম, সংগ্রামীদের পতাকা ওরা ছিঁড়ল, অনশন মঞ্চ থেকে প্রফুল্লদাদের তুলে নিয়ে গেল, মঞ্চ ভেঙে দিল, রাতে পুলিশ এল। দ্যাখো, মেঝেতে বুটের লাথির চিহ্ন এখনও রয়েচে। ভয় পাইনি, সরিও নি। আমি কি অন্যায় কিছু করেছি যে সরব!

তবে ভেবে অবাক লাগে গো, ত্যাখন যারা ঝাঁকে ঝাঁকে আসত, এখন তারা কোথায় গেল? তারা দেখা হলে মুখ ফিরিয়ে নেয়, কতা বলে না। কেন রে বাবা? সহযোগীরা একে একে আলাদা হল কেন বুঝি না বাপু? আমরা কি কোনো অন্যায় করলাম?

এদ্দিন পর মন্ত্রী এল। অনেকে দুঃখের কতা বলতে 'বাংলোয়' গেস্‌লো —তাদের কতা বলতে দেওয়া হল না। কারখানা খুলল, কই, আমার ছেলেরা তো কাজ পেল না? কেন পাবে? ওরা তো তেল মারবে না, অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে। কারখানায় কাজ যারা পেল মনে হয় ওরাই ম্যানেজার, অথচ ভেতরে প্রতিবাদ করতে ভয় পায় —যদি বরখাস্ত হয়? একে মিল চালানো বলে? আদ্দেকের বেশি লোক কাজই পেল না। রিটায়ারদের কী হবে? যারা ভেতরে ঢুকেছে, যারা বাইরে আছে একসঙ্গে লড়তে হবে। আমি মনে করি, প্রতিবাদ না করলে কিচ্ছু হবে না। শ্রমিকদের জন্যে কে দরদ দেখাবে? যে দরদ দেখাবে (প্রফুল্লদা) তাকে তো মেরে ফেলতে চাইছে! তাকে জেল খাটালো। আমাদের ফের ঘুরে দাঁড়াতেই হবে। পাওনাগণ্ডা ছেড়ে দেবো নাকি!!

আগাগোড়া জুলুমের বিরুদ্ধে খায়রুল মল্লিকের
স্ত্রী জাহানারা বেগম

প্রথম অবরোধের সময় মানে আন্দোলন যখন শুরু, আমার ছোট মেয়ে তখন পেটে। কী করে যাব! বাড়ির সবাই ভয় দেখাল 'পুলিশ আসবে, মারপিট হবে, কী করে যাবি?' মন চাইছে যেতে কিন্তু যাইনি। আন্দোলনের জন্য মন আমার প্রথম থেকেই আছে। আন্দোলন আমি ভালোবাসি। লড়াই ভালো না বাসলে আমার ছেলেমেয়ের বাপ কি এগোতে পারত? সব মনে আছে —মিলের তালা কুলে ঢোকা হল, ক্যান্টিন চালু হল, মেশিন চলল। তখন তো কারখানা গেটেই বস্ থাকতাম। কচি বাচ্চা নিয়ে দুগ্গাপুর (কাঁচ কারখানা) গেছি। কলকাতা কতবার গেছি তার ঠিক নেই। রান্নাঘরের খাবার আসত। আর প্রত্যেকদিন রিপোটার আসচে, কত বড়ো বড়ো লোক আসত। আমি দৌড়ে যেতাম, পাঁচ মিনিটের জন্য হলেও ছুটে যেতাম। ঘরে খাটি —বিড়ি বাঁধি। দু'মেয়ে জরির কাজ করে। ওর বাবাকে জিজ্ঞেস করি আন্দোলন কেন কমে যাচ্ছে? সে বলে, 'দালালরা বেইমানি করছে ...লোক ভয় পাচ্ছে সরে যাচ্ছে। লোককে ঘুরে আসতেই হবে। আস্তে আস্তে হবে।' আগের লড়াই এখন নেই, তবে কারখানার লোককেই আগে জাগতে হবে। আমি যদি না লড়ি অন্যেরা আসবে কেন?

সহযোগী আর শ্রমিকরা কেউ কেউ মালিকের কোলে গেছে। ওরা আন্দোলনের ক্ষতি করেছে। আন্দোলন যে দুব্বল হল তার কারণ এটাই। তবে বেশির ভাগ শ্রমিক সংগ্রামীদেরই চায়। পেটের জন্যে তারা আসতে পারে না জানো? সংসার চালাতে পড়ে থাকতে হয়। এখনও সবাই পাসারির বিপক্ষে, নইলে কি দু'হাজার শ্রমিক সই দেয়? বলে আন্দোলন উটুক, আমরা আবার যাব।

মিলটা ভালভাবে চালানোর জন্য যতদিন আন্দোলন চলবে আমি লড়াই করব। তাতে যদি জীবনটা চলে যায় তবু লড়াই ছাড়বো না। শরীরটা এখন খারাপ হয়ে গেছে —পায়ে ব্যতা,

কোমরে ব্যতা ...বড়ি খাই। সবখানে যেতে পারি না। লড়াই করতে করতে আমরা ঠিকই জিতব —মিল আমাদেরই হবে।

লেখাপড়া জানা প্রতিবাদী শ্রমিক নিখিল মজুমদারের স্ত্রী কনক মজুমদার কী বলছেন

ঠিক শুরুর সময় থেকে আমি আন্দোলনে যোগ দিতে পারিনি, মেয়ে খুব ছোট ছিল। তবে শ্রমিকদের মুখে শুনে শুনে, খবরের কাগজ পড়ে জানতে বুঝতে চেষ্টা করতাম। তখনই মনে হয়েছে, লড়াইটা শুরু হয়েছে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবির জায়গা থেকে। প্রথম প্রথম সব কথা বিশ্বাস করতে পারতাম না। আস্তে আস্তে মিলগেটে যাচ্ছি, মিটিং টিটিং-এ থাকছি, নিজের মনে বিশ্বাস আসতে লাগল। 'রেলরোকো'তে যাওয়ার খুব কৌতুহল —কিন্তু কী করে যাই, ছোটো মেয়ে নিয়ে! রান্নাঘরেও অংশ নিতে পারিনি, যদিও আমার বাড়ি খাবার আসত।

কাগজপত্র পড়তে পড়তে বুঝলাম, শ্রমিক শোষণ করার জন্যই মালিক কারখানা বানায়। কানোরিয়ার বিশেষত্ব হল শ্রমিকদের অংশগ্রহণ, সাধারণ সভা, সেখান থেকে কর্মসূচি উঠে আসা। নামী ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের উপর শ্রমিকদের ছিল ঘেন্না আর অবিশ্বাস।

কুশল দেবনাথ নাজিবর রহমানরা যখন বেরিয়ে গেল মনে হয়েছে, আন্দোলন পেছিয়ে পড়ছে। নেতারা শ্রমিকদের ভাঙিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তাতেই মনে হয়েছে আন্দোলনটা দুর্বল হচ্ছে। এরপর থেকেই আন্দোলনের সঙ্গে অমি ঘনিষ্ঠ হতে থাকি। সহযোগী বা শ্রমিক যারা আমার বাড়ি আসত, তাদের কাছে অনেক বিষয় জানতে বুঝতে চাইতাম। কেশব, শ্যামদা, বিকাশদা, তপন অনেক শ্রমিকই আসত। এদের দু-একজন ছাড়া বাকিরা আন্দোলন ত্যাগ করেছে।

আমি ভাবি, এ আন্দোলন কী করে জাগিয়ে তোলা যায়। আইনি পথেও অনেক বাধা। সমবায় আইন আছে, তা সত্ত্বেও শ্রমিকদের সমবায় করতে দেওয়া হচ্ছে না। মানুষকে তো বেঁচে থাকতে হবে! মানুষের কাছে তাই আবেদন নিয়ে যেতে হচ্ছে, বলতে হচ্ছে, আন্দোলনে অংশগ্রহণ করুন, এটা আপনারও আন্দোলন। এমন কি কারখানার হাজিরাবাবুকেও বলতে হবে —প্রাপ্য পাবেন, আপনি আসবেন না? শত্রুরা শ্রমিকদের একত্রিত হতে দিচ্ছে না দেবে না, নানা কথায় তাদের দমিয়ে দেবে। অবসর পাওয়া শ্রমিক আর কর্মক্ষম শ্রমিক সবাইকে একত্রিত হতে হবে। সে চেষ্টা চালাতে হবে আমাদেরই।

আন্দোলনে থাকব না ভাবতেই পারি না। তবে একটা ভয় —প্রফুল্লদা সুস্থ থাকার মধ্যে আন্দোলনে বিজয়ী হতে হবে।

উমা

খনিজ আকরিক উত্তোলন এক সর্বনাশা তাণ্ডব

ছোটনাগপুর মালভূমিটির মনুষ্যকৃ দ্রুত ধ্বংসসাধন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের পর এই মালভূমিটির অরণ্য অঞ্চলে নয়া উদারনীতিবাদীদের বিনিয়োগের ফলাফল ঠাণ্ডা মাথায় মূল্যায়নের অনুভব করলাম। বেশ কয়েকটি উপজাতি সম্প্রদায় ও প্রচুর বন্যপ্রাণীর চমৎকার আবাসস্থল এই অরণ্য অঞ্চল। এই সমালোচনামূলক লেখাটায় আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করেছি। সেটি হল এই মালভূমিটির জঙ্গলের বাস্তুতন্ত্রের ---বাস্তুতন্ত্রগতভাবে যা ভীষণ স্পর্শকাতর ---জীবগত ও ভূ-সামাজিক ক্ষেত্রে মুক্তবাজার অর্থনীতিতাড়িত কর্মকাণ্ডের ফলাফল।

৩০ হাজার বর্গ কিমি অধ্যুষিত এই মালভূমি অঞ্চলটি তিনটি রাজ্যের ১৩টি জেলার মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। রাজ্য তিনটি হল উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গ। এই পাহাড়ি তরঙ্গায়িত মালভূমির প্রায় শতকরা ৩০ ভাগের ওপর জঙ্গলে ঢাকা, খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চলে রয়েছে কয়লা, ক্রোমাইট, স্বর্ণ আকরিক ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ। পৃথিবীর মোট ক্রোমাইট আকরিকের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ এই অঞ্চলে মজুত, বিশাল পরিমাণ কয়লা এবং প্রায় ১০ বিলিয়ন টন লোহার আকরিক এখানে রয়েছে। অন্তত ২৫টি উপজাতি সম্প্রদায় এবং এক বিরাট সংখ্যক বৈচিত্রপূর্ণ বন্যপ্রাণী এই ক্রান্তীয় অঞ্চলে এখনও টিকে রয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের চোখে পড়ে এই জঙ্গলটা। ১৮৯১-৯২ সময়পর্বে বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথ নির্মাণের জন্য এই অঞ্চলে ব্যাপকভাবে গাছ কাটা শুরু হল। ১৮৯৫-৯৮ সময়পর্বে বেরিলি-বেনারস রেলপথের জন্য ২ লাখ শালগাছের স্লিপার এই অঞ্চল থেকে সরবরাহ করা হয়। সাম্রাজ্যবাদী প্রয়োজন মেটাবার জন্য ১৮৭৮ সালের ভারতীয় বনাঞ্চল আইন এই অঞ্চলের মূল্যবান বনজ সম্পদের ওপর ঔপনিবেশিকদের চরম নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে। ১৮৮৪ সালে কল্‌হন, সারান্দা ও সরাইকেল্লার বিশাল বনাঞ্চল দেশের প্রথম সংরক্ষিত বনাঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করা হল। ব্রিটিশরা বনাঞ্চলে বসবাসকারী উপজাতি জনগণের হাত থেকে জঙ্গলের ওপর তাঁদের মালিকানার অধিকার কেড়ে নিল। ফলস্বরূপ তাঁদের গৃহপালিত পশু চরানোর জন্য, ঘরের চাল তৈরির রসদ সংগ্রহের জন্য মূল্য দিতে হত। যারা জঙ্গলের চিরকালের অধিবাসী তাঁরাই এখন হয়ে গেল 'দখলদার'। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক, সরকার তাঁদের উচ্ছেদ_

করা থেকে বিরত রইল। এমন কি, স্বাধীনতার ৬০ বছর পরেও বন কর্তৃপক্ষের মানসিক গড়ন পূর্ববর্তী ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক মানসিকতার জের টেনে চলেছে। খুব অদ্ভুত ব্যাপার, স্বাধীন ভারতের বনাঞ্চল নীতি এখনও ১৯২৭ সালের ভারতীয় বনাঞ্চল আইন দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে, যে আইন আসলে ১৮৭৮ সালের বনাঞ্চল আইনেরই অপরিবর্তিত রূপ। এই ব্যাপারে স্বাধীন ভারতের বনদপ্তর পূর্ববর্তী ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের থেকে আরও বেশি আগ্রাসী। তারা তাঁদের রাজনৈতিক প্রভুদের খেয়ালমত কাজ করতে গিয়ে বনের অধিবাসীদের —মানুষ ও প্রাণী —প্রায় নিশ্চিহ্ন করে এনেছে।

বনের সাথে সম্পর্কিত স্বাধীন ভারতের প্রথম আইন চালু হয় ১৯৫০ সালে। কেন্দ্রীয় বন পর্ষদ বনে বসবাসকারী মানুষদের দখলীস্বত্ত্ব ও অস্তিত্বের অধিকার কেড়ে নেয়, তাঁদের আশ্রয়হীন ও বিপর্যস্ত করে তোলে। সেই সময় এমন কি কমিউনিস্টরাও এই দানবীয় আইনের বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদ করে নি। ভারতবর্ষ সবসময় অ-উপজাতি সম্প্রদায়ের দ্বারা শাসিত হয়ে এসেছে যাঁদের কাছে বনের অধিবাসীরা জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটা বাঁধা ছাড়া আর কিছুই নয়। সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্খার প্রতি সম্পূর্ণ অজ্ঞ ক্যাম্ব্রিজ শিক্ষিত প্রধানমন্ত্রী ও হার্ভার্ড শিক্ষিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের বিশ্বাস করাতে চান যে বনবাসীরাই জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় হুমকি।

অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ বাস্তুতন্ত্রের অস্তিত্ব বজায় রেখে পণ্য জোগানের যে সুবিশাল ক্ষমতা বনাঞ্চলের রয়েছে তাঁকে উপেক্ষা করে বর্তমানের বন নিয়ন্ত্রণাধিকারীরা বনসম্পদকেই পণ্য বলে মনে করে এবং বনাঞ্চলকে চাহিদা-যোগানের অর্থনীতির খেয়ালি শিকারে পরিণত করে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আগ্রাসী প্রয়োজন অনুমোদিত প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিসম্পন্ন 'উন্নত' অর্থনীতির দাবির কাছে মুনাফা ছাড়া আর কিছুই যারা বোঝে না এইরকম সব ভারতের রাজনৈতিক তাত্ত্বিকরা নির্লজ্জভাবে আত্মসমর্পণ করতে রাজি হয়েছে এবং নব্য উদারীকরণ যুগের সূচনা করেছে। নব্য উদারবাদীরা মনে করে অর্থনৈতিক উন্নতি একমাত্র উদারীকৃত (liberalised) বাণিজ্যের মধ্য দিয়েই অর্জন করা যেতে পারে। তাঁরা আরও মনে করে বিশ্বায়নের স্বার্থে বাজার খুলে দেওয়া উচিত এবং জাতির ও বিশ্বের রাজনীতি ও অর্থনীতির অগ্রাধিকার নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে প্রাইভেট সেক্টরকেই সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া উচিত।

ভারতের জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে আমার এই দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে ১৯৯১-এ ভারতীয় অর্থনীতির উদারীকরণ বন্যপ্রাণীদের আবাসস্থলের ওপর প্রচণ্ড ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলেছে, মূলত বনাঞ্চলে সম্পদ লুণ্ঠনের নকশাটা বদলে ফেলার কারণে। 'উন্নয়নে'র ধ্বজাধারীদের খনিজ উত্তোলন নামক কর্মকাণ্ডের আক্রমণের ফলে বনের উদ্ভিদ ও প্রাণীদের বেঁচে থাকার প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় ইতিমধ্যেই ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছে। এই আক্রমণ শান্ত, বাধ্য উপজাতি সম্প্রদায়কে আগ্রাসী করে তুলেছে। এই বিষয়টায় মোটামুটি সকলেই একমত যে ওপর খোলা খনি (open cast) যা সমস্ত উদ্ভিদসহ বিশাল বনাঞ্চল কেটে পরিষ্কার করে ফেলে, তা অন্য যে কোনও ধরনের শিল্প প্রচেষ্টার থেকে বনের বাস্তুতন্ত্রের অনেক বেশি ক্ষতি করে। এটাও সকলের জানা যে কম চেষ্টায় বিশাল পরিমাণ লাভ হয় অ-নবীকৃত (non-renewable) সম্পদকে স্রেফ তুলে এনে বিক্রি করার মধ্য দিয়ে। এমন কি এই উত্তোলন চলে বাস্তুসংস্থানগতভাবে ভীষণ ভঙ্গুর সে সব জায়গাতেও। ভারতসহ এইরকম অনুন্নত দেশের ডজন ডজন উদাহরণ আছে যেগুলিকে নয়া ঔপনিবেশিক অত্যাচার হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে যা সাধারণ মানুষকে প্রান্তিক মানুষে আর ধনীকে আরও ধনী করে তুলছে।

ছোটনাগপুরের মালভূমি দেশের লৌহ ও ক্রোমাইট আকরিকের বৃহত্তম ভাণ্ডার। দেশের মোট মজুত ২৫ বিলিয়ন টনের শতকরা ৬১ ভাগের বেশি ছোটনাগপুরে রয়েছে। ২০০৮ সালে চীনে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান এবং সেখানকার গ্রামগুলিতে উঁচু উঁচু বাড়ি নির্মাণ ওই দেশের নির্মাণশিল্পে এক অভূতপূর্ব জোয়ার এনে দেয়। একবিংশ শতাব্দীর শুরুটা দেখল চীনের লোহা আকরিকের চাহিদা বৃদ্ধি। এটা খুব মজার বিষয় ভারতের মজুত লোহা আকরিকের পরিমাণ ২৫.২৪ বিলিয়ন টন আর চীনের ২০০ বিলিয়ন টন হওয়া সত্ত্বেও চীন তার দেশের লোহা আকরিক মজুত রেখে ভারত থেকে আমদানি করছে। ভারতের এই রপ্তানি বৃদ্ধির ফলে ভারত সরকার জাতীয় খনিজ নীতির (National mineral policy) পরিবর্তন ঘটিয়েছে। ১৯৯৩ সালের এই নীতি নির্দ্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সম্পদ খনন ও আহরণের ক্ষেত্রে পূর্বে যে বিধিনিষেধ ছিল যেগুলি বাতিল করে ব্যক্তিগত বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা হল। পূর্বে কেবলমাত্র উৎপাদকের ক্ষেত্রে এইসব জাতীয় সম্পদ আহরণের অনুমতি দেওয়া হত তাদের নিজেদের ব্যবহারের জন্য। একমাত্র রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত জাতীয় খনিজ উন্নয়ন পর্ষদ (Natinal Mineral Development Corporation) খনিজ আকরিকের ব্যবসা করতে পারত। ১৯৯৩ সালের সংশোধনী এমন কি পণ্য ব্যবসায়ীদের দুষ্প্রাপ্য খনিজ সম্পদ আহরণ ও রপ্তানির অনুমতি দিল। বিশাল মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা বেআইনি খনিজ সংস্থার সংখ্যাবৃদ্ধিতে উৎসাহিত করল। ব্যবসায়ীদের লাভের মার্জিন ছিল অবিশ্বাস্য। ২০০৭ সালে আকরিক উত্তোলন ও রপ্তানির জায়গা পর্যন্ত পরিবহনের খরচ ছিল টন প্রতি ২৫০ টাকা থেকে ৩২৫ টাকার মধ্যে। সেখানে বিক্রি করা হত টন প্রতি ৪০০০ টাকায়।

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদের ৬৫তম

সভায় উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী ব্যবসায়ীদের খনিজ আকরিক উত্তোলনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির প্রস্তাব দিয়েছেন। তিনি তাঁর রাজ্যের খনিজ কোম্পানিগুলির অস্বাভাবিক মুনাফা লাভের প্রতি পর্ষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে, এই খনিজ কোম্পানিগুলির বার্ষিক লাভ রাজ্যের বার্ষিক পরিকল্পনার জন্য অনুমোদিত ব্যয়কেও ছাপিয়ে গেছে। দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হল মুখ্যমন্ত্রীর মনে এই নিষিদ্ধকরণের ভাবনা এল বড্ড দেরিতে। তিনি তাঁর রাজ্যের বনাঞ্চলের ব্যাপক ধ্বংসের অনুমোদন নিজেই দিয়েছিলেন। চীনে লোহার আকরিকের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে তাল রেখে ছোটনাগপুর মালভূমিতে ব্যাপক আকারে খোলামুখ খনি খননের জন্য ব্যবসায়ীদের অনুমতি দেওয়া হল। তাদের এই বনাঞ্চলের বাস্তুতন্ত্র রক্ষার ব্যাপারে কোনও মাথাব্যথাই ছিল না। চারপাশের সবুজের মাঝখানে এই খোলামুখ খনিগুলিকে দেখায় দগদগে ঘায়ের মতো। পরিণতিস্বরূপ উড়িষ্যার কেওনঝড় পাহাড়ী এলাকার ৬৪ হাজার হেক্টর এবং ঝাড়খণ্ডের সিংভূম জেলার ১১ হাজার হেক্টর বনাঞ্চলে বন্যপ্রাণী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ৮০ হাজার হেক্টরের বেশি অঞ্চল উদ্ভিদশূন্য করে দেওয়া হয়েছে, আদিবাসী মানুষেরা উচ্ছেদ হয়েছেন নিজের বাসভূমি থেকে। স্বাভাবিক জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা পাল্টে গেছে যার ফলে স্থায়ী জলাশয়গুলি শুকিয়ে যাচ্ছে। অনেক এলাকায় মাটির তলার সঞ্চিত জলের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। সংলগ্ন গ্রামগুলিতে কুয়ো খুঁড়লে জল পাওয়া যাচ্ছে না। আমি দেখেছি, মুনাফালোভীদের মুনাফার একমুখী লক্ষ্যে চালিত এই ধ্বংসাত্মক উদ্যোগ প্রায় সব ক্ষেত্রেই গ্রহণ করা হয়েছে এই অঞ্চলের অন্যান্যদের টিকে থাকার প্রশ্নকে গুরুত্ব না দিয়েই। এ ছাড়া আকরিক উত্তোলনের সাথে যুক্ত অন্য বিষয়গুলি যেমন, পাথর গুঁড়ো করার মেসিন, আকরিক ভাঙার জন্য বিস্ফোরণ, রাস্তা দিয়ে আকরিক বহন গাড়ির অনবরত যাতায়াত পরিবেশ ধ্বংসসাধন ত্বরান্বিত করেছে।

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট দুষ্প্রাপ্য জাতীয় সম্পদ আহরণের জন্য লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রে নিলাম ডাকা নিশ্চিত করার ডাক দিয়েছে। তা সত্ত্বেও জঙ্গলে মাইনিং লিজ নিতে আগ্রহী যে কোনও ব্যক্তি হেক্টর প্রতি ৯.৫ লক্ষ টাকা হিসাবে ব্যাগভর্তি টাকা নিয়ে পরিবেশ ও বন দপ্তরের অফিসে হেঁটে গিয়ে টেবিলের ওপর জমা দিয়ে ভারতের যে কোনও সংরক্ষিত বনে খনিজ উত্তোলনের লিজ পেয়ে যেতে পারেন।

(দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকায় ২৬ এপ্রিল ২০১২-য় প্রকাশিত কিশোর চৌধুরীর 'দ্য মাইনিং মেইহেম' নামক প্রতিবেদনের অনুবাদ এটি। অনুবাদ করেছেন অরুণ পাল)

উমা

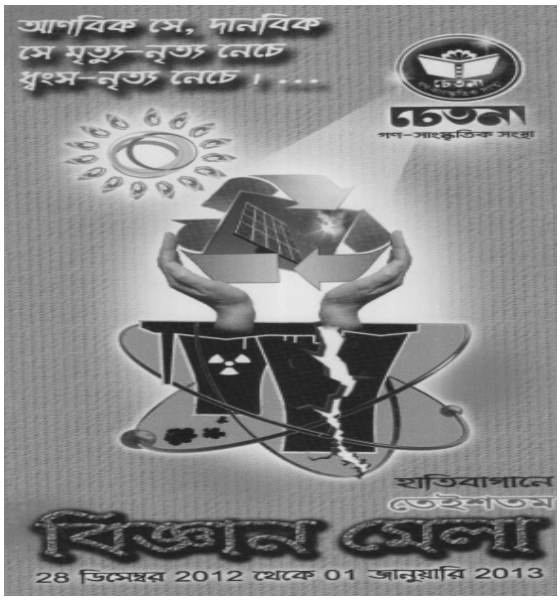

চেতনা-র বিজ্ঞান মেলা দেখতে দেখতে ২৩ বছরে। নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও মেলাটি তার বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখেছে। ২৮ তারিখে তুষার চক্রবর্তী, রুশতী সেন, স্বপন জানা, পথিক গুহ প্রমুখের উপস্থিতিতে শুরু হয় মেলার। এবারেও ছিল প্রদর্শনী। বিশেষ প্রদর্শনীতে জ্যোতিষের বুজরুকি, চিকিৎসার আবর্জনা, কৃত্রিম স্মৃতি ও কম্পিউটারের মতো আকর্ষণীয় বিষয় ছিল। ধর্মগ্রন্থে নারীর অধিকার, বিস্মৃত ভূমিজ্ঞানী প্রমথনাথ বসু, জলবাহিত রোগ, বিষাক্ত প্রসাধনী, পরমাণু বিদ্যুতের বিপদ ইত্যাদি বিষয় উঠে এসেছিল পোস্টার প্রদর্শনীতে। এ ছাড়াও প্রজেক্টরের সাহায্যে দেখানো হয়েছে তারামণ্ডল। প্রতিবারের মতো ছোট পত্রিকাদের নিয়ে লিট্‌ল ম্যাগাজিন মেলাও বসেছে। বিনোদিনী অঙ্গন-এ ২৯ থেকে ৩১ ডিসেম্বর প্রতিদিনই ছিল আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বাঁশী, বহুরূপী মূকাভিনয়, অণুনাটক, নাটক। শ্রুতিনাটক 'বিনোদিনী কথা' ছিল অন্যতম আকর্ষণ। অনার্য প্রযোজিত এই শ্রুতিনাটকে অংশ নেন সুরজিৎ ও অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নটী বিনোদিনীর বাসস্থান হাতিবাগানের ওই পাড়াতেই। উপেক্ষিতা এই মহান অভিনেত্রীর সম্মানে চেতনা প্রতিবছরই একজন অন্তরালবাসী অতীত তারকাকে সম্মান জানায় 'বিনোদিনী দেবী স্মৃতি সম্মান' দিয়ে। মেলার শেষ দিন, ২রা জানুয়ারি সম্মান জানানো হল যাত্রার বিশিষ্ট অভিনেত্রী ছন্দা চট্টোপাধ্যায়কে। বেশ কয়েকজন নামী নাট্যব্যক্তিত্বও উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়াও বিনোদিনীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ছিল তাঁর অভিনীত নাটকের আলোকচিত্র নিয়ে তথ্যচিত্র 'বিনোদ কথা'। দীর্ঘদিন ধরে এমন সুন্দর ও বৈচিত্র্যময় বিজ্ঞান মেলা আয়োজনের জন্য চেতনা-র অশেষ সাধুবাদ প্রাপ্য।

উমা

বইমেলায় উৎস মানুষ স্টল নং ১৩৭

টুকরো খবর

ঝাঁপিয়ে স্বাস্থ্য

বুলগেরিয়ায় সোফিয়া নামে একটি হ্রদ আছে। শীতের এই কনকনে ঠাণ্ডায় সেই জলে দুদ্দাড় করে লাফিয়ে পড়েছে পালে পালে লোক। চলেছে প্রতিযোগিতা, কে আগে ডুব দিয়ে ছুঁড়ে-ফেলা কাঠের ক্রশ তুলে নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু নিউমোনিয়া হওয়ার ভয় তুচ্ছ করে একটা ক্রশ তুলে আনার জন্য কেন এই উদ্দীপনা। ওখানকার লোকেদের বিশ্বাস, যে আগে ওই ক্রশ তুলে আনতে পারবে, সে সারা বছর সুস্থ থাকবে। ৭ জানুয়ারি, রবিবারটিকে খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীরা 'এপিফ্যানি ডে' হিসাবে পালন করেন। এই উপলক্ষেই বিভিন্ন জায়গাতেই অর্থোডক্স প্রিস্ট ক্রশ জলে ছুঁড়ে ফেলেন। ইস্তাম্বুলের বসফরাস নদী থেকে বুখারেস্টের ব্ল্যাক সি— সব জায়গাতেই এই দিনটি এইভাবে পালিত হয়েছে। সারা বছর সুস্থ থাকার এমন সহজ উপায় হাতছাড়া করতে কে-ই বা চাইবে! তবে ঠাণ্ডা জলে নামার জন্য কতজন নিউমোনিয়া হয়ে মারা পড়েন, তার হিসাব অবশ্য পাওয়া যায় না!

উৎস মানুষ পত্রিকার গ্রাহক হতে হলে

গ্রাহক চাঁদা বছরে ১০০ টাকা। বছরের যে কোনও সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

United Bank of India, College Street Branch, Kolkata - 7000073. Utsa Manush, SB Account No. 0083010748838।

এই অ্যাকাউন্ট নম্বরে **UBI**-এর যে কোনো শাখায় টাকা জমা দিন অথবা আমাদের ঠিকানায় চেক পাঠান। ফোন করে কিংবা ই-মেল করে আপনার ঠিকানা এবং কোন মাস থেকে গ্রাহক হলেন জানিয়ে দিন। ডাকে পত্রিকা পাঠানো হবে।

প্রাপ্তিস্থান: দীপক কুণ্ডু, ২৯/ ৩, শ্রী গোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা-১২, বই-চিত্র (কফি হাউসের তিন তলা), পাতিরাম, বুক মার্ক, অমর কোলে (বিবাদী বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), সৈকত প্রকাশন (আগরতলা), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন (বেনিয়াটোলা লেন, কলেজ স্ট্রীট), মনীষা গ্রন্থালয় (কলেজ স্ট্রীট)। বইকল্প, ১৮ বি, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ), কলকাতা- ৭০০০৩১।

উৎস মানুষ

পুস্তক তালিকা

• বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান (১) সংকলন	৩৫.০০
• যে গল্পের শেষ নেই দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৫০.০০
• বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ (৫ম প্রকাশ) সংকলন	৪২.০০
• প্রেসিডেন্ট বুশ-এর এই যুদ্ধ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত	৩০.০০
• তিন অবহেলিত জ্যোতিষ্ক (১ম) রণতোষ চক্রবর্তী	১৮.০০
• বাংলা বন্‌ধ বা শেষের শুরু হিমানীশ গোস্বামী	৪০.০০
• এটা কী ওটা কেন সংকলন	৫০.০০
• আমরা জমি দেই নি, দেব না'	১০.০০
• আয়ুর্বেদে বিজ্ঞান সংকলন	৫০.০০
• আরজ আলী মাতুব্বর ভবানীপ্রসাদ সাহু	২০.০০
• প্রতিরোধ: অন্ধতা ও অযুক্তির বিরুদ্ধে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত (৩য়)	৬০.০০
• বিবেকানন্দ অন্য চোখে/ সমীক্ষা ও আরো কিছু বিতর্ক	১০০.০০
• শেকল ভাঙা সংস্কৃতি	৬০.০০
• প্রমিথিউসের পথে	৩৫.০০